সাহিত্য-মঞ্জুষা

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book on Bengali for Class VI
(Vide Notification No. T.B/74/VI/T.B/57/Dated 24.11.76)

সাহিত্য-মঞ্জুষা

[ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য]

শ্রীদুলালচন্দ্র দত্ত এম. এ., বি. টি.
শিক্ষক
দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যাণ্ট বি-জোন বয়েজ মাল্‌টিপারপাস স্কুল
দুর্গাপুর-৫ (বর্ধমান)
প্রাক্তন সহকারী শিক্ষক
পাঁচাল উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
পাঁচাল (বাঁকুড়া)

মোহন লাইব্রেরী
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
৩৫-এ, সূর্য সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীজীবন কুমার বসু
মোহন লাইব্রেরী
৩৫এ, সূর্য সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

দাম—৩.৫০ টাকা

মুদ্রণায় :
লক্ষ্মী-সরস্বতী প্রেস
২০৯-বি, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

গদ্যাংশ

পদ্যাংশ

[বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে বাংলা ভাষাকে যিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেই নোবেল-পুরস্কার-বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলতঃ কবি। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা ছিল সর্বতোমুখী। তাঁহার ছোট গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের এক একটি অমূল্য সম্পদ। এখানে রাজরাণী গল্পটি তাঁহার গল্পসল্প হইতে লওয়া হইয়াছে।]

এক যে ছিল রাজা, তাঁর ছিল না রাজরাণী। রাজকন্যার সন্ধানে দূত গেল অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মগধ কোশল কাঞ্চী। তারা এসে খবর দেয় যে, মহারাজ সে কী দেখলুম! কারু চোখের জলে মুক্তো ঝরে, কারু হাসিতে খসে পড়ে মাণিক। কারু দেহ চাঁদের আলোয় গড়া—সে যেন পূর্ণিমা-রাত্রের স্বপ্ন।

রাজা শুনেই বুঝলেন, কথাগুলি বাড়িয়ে বলা। রাজার ভাগ্যে সত্য কথা জোটে না অনুচরদের মুখ থেকে। তিনি বললেন, আমি নিজে যাব দেখতে।

সেনাপতি বললেন, তবে ফৌজ ডাকি?

রাজা বললেন, লড়াই করতে যাচ্ছি নে।

মন্ত্রী বললেন, তবে পাত্রমিত্রদের খবর দিই?

রাজা বললেন, পাত্রমিত্রদের পছন্দ নিয়ে কন্যা দেখার কাজ চলে না।

—তাহ'লে রাজহস্তী তৈরী করতে বলে দিই ?

—রাজা বললেন, আমার এক জোড়া পা আছে।

—সঙ্গে কয়জন যাবে পেয়াদা ?

রাজা বললেন, যাবে আমার ছায়াটা।

—আচ্ছা, তাহ'লে রাজবেশ পরুন—চুনি-পান্নার হার, মাণিক লাগানো মুকুট, হীরে লাগানো কাঁকন আর গজমোতির কানবালা।

রাজা বললেন, আমি রাজার সঙ সেজেই থাকি ; এবার সাজব সন্ন্যাসীর সঙ।

মাথায় লাগালেন জটা, পরলেন কপনি, গায়ে মাখলেন ছাই, কপালে আঁকলেন তিলক, আর হাতে নিলেন কমণ্ডলু আর বেল কাঠের দণ্ড। "বোম্ বোম্ মহাদেব" বলে বেরিয়ে পড়লেন পথে। দেশে দেশে রটে গেল—বাবা পিনাকীশ্বর নেমে এসেছেন হিমালয়ের গুহা থেকে, তার একশো-পঁচিশ বছরের তপস্যার শেষ হ'ল।

রাজা প্রথমে গেলেন অঙ্গদেশে। রাজকন্যা খবর পেয়ে বললেন, ডাকো আমার কাছে।

কন্যার গায়ের রঙ উজ্জ্বল, শ্যামল চুলের রঙ যেন ফিঙের পালক, চোখ দুইটি হরিণের চমকে উঠা চাহনি। তিনি বসে বসে সাজ করছেন। কোন বাঁদী নিয়ে এল স্বর্ণচন্দন-বাঁটা, তাতে মুখের রঙ হবে যেন চাঁপা ফুলের মতো। কেউ বা আনল ভৃঙ্গলাঞ্ছন তেল, তাতে চুল হবে যেন পম্পাসরোবরের ঢেউ। কেউ বা আনল মাকড়সাজাল শাড়ী, কেউ বা আনল হাওয়া-হালকা ওড়না। এই করতে করতে দিনের তিনটে প্রহর যায় কেটে। কিছুতেই কিছু মনের মতো

হয় না। সন্ন্যাসীকে বললেন, বাবা আমাকে এমন চোখ-ভোলান সাজের সন্ধান বলে দাও, যাতে রাজরাজেশ্বরের লেগে যায় ধাঁধা, রাজকর্ম যায় ঘুচে, কেবল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দিনরাত্রি কাটে।

সন্ন্যাসী বললেন, আর কিছুই চাই না ?

রাজকন্যা বললেন, না আর কিছুই না।

সন্ন্যাসী বললেন, আচ্ছা আমি তবে চললেম ; সন্ধান মিললে না হয় আবার দেখা দেব।

রাজা সেখান থেকে গেলেন বঙ্গদেশে। রাজকন্যা শুনলেন সন্ন্যাসীর নামডাক। প্রণাম করে বললেন, বাবা, আমাকে এমন কণ্ঠ দাও, যাতে আমার মুখের কথায় রাজরাজেশ্বরের কান যায় ভরে, মাথা যায় ঘুরে, মন হয় উতলা। আমার ছাড়া আর কারও কথা যেন তাঁর কানে না যায়। আমি যা বলাই তাই যেন বলেন।

সন্ন্যাসী বললেন, সেই মন্ত্র আমি সন্ধান করতে বেরলুম। যদি পাই তবে ফিরে এসে দেখা হবে। বলে তিনি গেলেন চলে।

গেলেন কলিঙ্গে। সেখানে আর এক হাওয়া অন্দরমহলে। রাজকন্যা মন্ত্রণা করছেন কী করে কাঞ্চী জয় করে তাঁর সেনাপতি সেখানকার মহিষীর মাথা হেঁট করে দিতে পারে, আর কোশলের গুমরও তার সহ্য হয় না। তার রাজলক্ষ্মীকে বাঁদী করে তাঁর পায়ে তেল দিতে লাগিয়ে দেবেন।

সন্ন্যাসীর খবর পেয়ে ডেকে পাঠালেন। বললেন, বাবা শুনেছি সহস্রঘ্নী অস্ত্র আছে শ্বেতদ্বীপে যার তেজে নগর, গ্রাম সমস্ত পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আমি যাঁকে বিয়ে করব, আমি চাই তাঁর পায়ের কাছে বড়ো বড়ো রাজবন্দীরা হাত জোড় করে থাকবে, আর রাজার মেয়েরা

বন্দিনী হয়ে কেউ বা চামর দোলাবে, কেউ বা ছত্র ধরে থাকবে, আর কেউ বা আনবে তাঁর পানের বাটা।

সন্ন্যাসী বললেন, আর কিছু চাই নে তোমার?

রাজকন্যা বললেন, আর কিছুই না।

সন্ন্যাসী বললেন, সেই দেশ-জ্বালানো অস্ত্রের সন্ধানে চললেম।

সন্ন্যাসী গেলেন চলে। বললেন, ধিক্! চলতে চলতে এসে পড়লেন এক বনে। খুলে ফেললেন জটাজুট। ঝরণার জলে স্নান করে গায়ের ছাই ফেললেন ধুয়ে। তখন বেলা প্রায় তিন প্রহর। প্রখর রোদ, শরীর শ্রান্ত, ক্ষুধা প্রবল। আশ্রয় খুঁজিতে খুঁজিতে নদীর ধারে দেখলেন একটি পাতার ছাউনি। সেখানে একটি ছোটো চুলা বানিয়ে একটি মেয়ে শাকপাতা চড়িয়ে দিয়েছে রাঁধবার জন্য। সে ছাগল চরায় বনে, সে মধু জড়ো করে রাজবাড়িতে যোগান দিতে। বেলা কেটে গেছে এই কাজে। এখন শুকনো কাঠ জ্বালিয়ে শুরু করেছে রান্না। তার পরনের কাপড়খানি দাগপড়া, তার দুই হাতে দুটি শাঁখা, কানে লাগিয়ে রেখেছে একটি ধানের শিষ। চোখ দুটি তার ভ্রমরার মতো কালো। স্নান করে সে ভিজে চুল পিঠে মেলে দিয়েছে যেন বাদল শেষের রাত্তির।

রাজা বললেন, বড় খিদে পেয়েছে।

মেয়েটি বললে, একটু সবুর করুন আমি অন্ন চড়িয়েছি এখনি তৈরী হবে আপনার জন্য।

রাজা বললেন, আর তুমি কী খাবে তাহ'লে?

সে বললে, আমি বনের মেয়ে, জানি কোথায় ফলমূল কুড়িয়ে পাওয়া যায়। সেই আমার হবে ঢের। অতিথিকে অন্ন দিয়ে যে পুণ্যি হয় গরীবের ভাগ্যে তা তো সহজে জোটে না।

রাজা বললেন, তোমার আর কে আছে?

মেয়েটি বললে, আছেন আমার বুড়ো বাপ, বনের বাইরে তাঁর কুঁড়েঘর, আমি ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই। কাজ শেষ করে কিছু খাবার নিয়ে যাই তাঁর কাছে। আমার জন্য তিনি পথ চেয়ে আছেন।

রাজা বললেন, তুমি অন্ন নিয়ে চলো, আর আমাকে দেখিয়ে দাও সেই সব ফলমূল যা তুমি নিজে জড়ো করে খাও।

কন্যা বললে, আমার যে অপরাধ হবে।
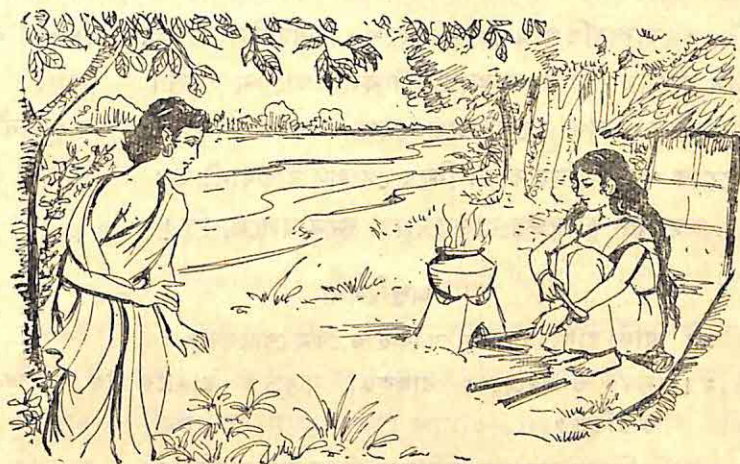
রাজা বললেন, তুমি দেবতার আশীর্বাদ পাবে। তোমার কোনো ভয় নেই। আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।

বাপের জন্য তৈরী অন্নের থালি সে মাথায় নিয়ে চলল। ফলমূল সংগ্রহ করে দুজনে তাই খেয়ে নিলে। রাজা গিয়ে দেখলেন, বুড়ো বাপ কুঁড়েঘরের দরজায় ব'সে।

সে বললে, মা আজ দেরি হ'ল কেন?

কন্যা বললে, বাবা অতিথি এনেছি তোমার ঘরে।

বৃদ্ধ ব্যস্ত হয়ে বললে, আমার গরীবের ঘর, কী দিয়ে আমি অতিথি-সেবা করব!

রাজা বললেন, আমি তো আর কিছুই চাই নে, পেয়েছি তোমার কন্যার হাতের সেবা আজ আমি বিদায় নিলেম। আর একদিন আসব।

সাতদিন সাতরাত্রি চলে গেল, এবার রাজা এলেন রাজবেশে। তাঁর অশ্ব রথ সমস্ত রইল বনের বাইরে। বৃদ্ধের পায়ের কাছে মাথা রেখে প্রণাম করলেন; বললেন, আমি বিজয়পত্তনের রাজা। রাণী খুঁজতে বেরিয়েছিলাম দেশ-বিদেশে। এতদিন পরে পেয়েছি—যদি তুমি আমায় দান করো আর যদি কন্যা থাকেন রাজী।

বৃদ্ধের চোখ জলে ভরে গেল। এল রাজহস্তী—কাঠকুড়ানী মেয়েকে পাশে নিয়ে রাজা ফিরে গেলেন রাজধানীতে।

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের রাজকন্যারা শুনে বললে, ছি!

অনুশীলনী

১। রাজা রাজবেশ ছেড়ে কোথায় ও কেন বেরলেন?

২। অঙ্গ ও বঙ্গদেশের রাজকন্যা সাধুবেশী রাজাকে কি নিবেদন করেছিল?

৩। কলিঙ্গের রাজকন্যাকে রাজার কেমন মনে হয়েছিল?

৪। রাজা কাঠকুড়ানী মেয়েকে বিয়ে করলেন কেন?

৫। শব্দার্থ লিখ:—

ফৌজ, পেয়াদা, কাঁকন, পিনাকীশ্বর, সহস্রঘ্নী।

৬। বাক্য রচনা কর:—

তপস্যা, গজমোতি, রাজরাজেশ্বর, চামর, আশীর্বাদ।

৭। কোন্‌টি কি পদ:—

ভৃঙ্গলাঞ্ছন, পম্পাসরোবর, বন্দিনী, অতিথি।

বাল্যশিক্ষা

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

[ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁহারা অহিংস পথের পথিক ছিলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ছিলেন তাঁহাদের পথিকৃৎ। দীর্ঘ সংগ্রামের পর তাঁহারই নির্দেশিত পথে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে। তিনি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার বাল্যশিক্ষার কয়েকটি ঘটনা এখানে সন্নিবেশিত হইয়াছে।]

তখন দোরাবাজী এতুলজী গীমি হেডমাষ্টার ছিলেন। ছাত্রেরা তাঁহাকে খুব ভালবাসিত। তিনি নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন ও শৃঙ্খলাপরায়ণ ছাত্রদের কাছ হইতে কাজ আদায় করিতেন, পড়াইতেনও ভাল। উপরের ক্লাসের ছাত্রদিগের ব্যায়াম করা তিনি বাধ্যতামূলক করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ব্যায়াম করা আমার ভাল লাগিত না। নিয়ম হওয়ার পূর্বে আমি কখনও ব্যায়াম করি নাই, বা ফুটবল কি ক্রিকেট খেলি নাই। আমার লাজুক স্বভাবও না খেলিতে যাওয়ার একটি কারণ ছিল। ব্যায়ামের সহিত শিক্ষার কোনও সম্বন্ধ নাই, আমার তখন এই প্রকার ভুল বিশ্বাস ছিল। এখন বুঝিতেছি বিদ্যাভ্যাসের মধ্যে শরীরিক শিক্ষাকে মানসিক শিক্ষার মতই স্থান দেওয়া উচিত।

তাহা হইলেও ব্যায়াম না করায় আমার যে ক্ষতি হয় নাই—এ কথাও আমি জানাইতে ইচ্ছা করি। একখানি বইতে আমি খোলা হাওয়ায় বেড়ানোর উপকারিতার কথা পড়িয়াছিলাম। কথাটা

আমার ভাল লাগে এবং তারপর হাইস্কুলের উপর শ্রেণী হইতেই আমি বেড়াইতে যাওয়ার অভ্যাস করি। বেড়ানো ব্যায়ামই বটে, আর সেইজন্যই আমার শরীর সুগঠিত ও মজবুত হইতে পারিয়াছিল।

পিতার সেবা করার গভীর ইচ্ছাও ব্যায়ামকে অপছন্দ করার আমার অন্যতম কারণ। স্কুল বন্ধ হইলেই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিয়া পিতার সেবায় লাগিয়া যাইতাম। যখন সকলের উপরেই ব্যায়াম করার আদেশ হইল তখন এই সেবায় বিঘ্ন পড়িল। পিতাঠাকুরের সেবার জন্য ব্যায়ামের ক্লাসে হাজিরা দেওয়া মাফ চাই বলিয়া অনুনয় করিয়াছিলাম। কিন্তু গীমি সাহেব কি আর মাফ করেন? এক শনিবারে প্রাতঃকালে স্কুল বসিয়াছিল। বিকালে চারটায় ব্যায়াম করিতে যাওয়ার কথা। আকাশ মেঘলা ছিল বলিয়া বেলা টের পাওয়া যায় নি। এই মেঘলা আকাশ আমাকে ঠকাইল। যখন ব্যায়ামস্থানে পৌঁছিলাম তখন সকলে ফিরিতেছে। পরের দিন গীমি সাহেব হাজিরা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, আমি অনুপস্থিত ছিলাম। আমাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বলিলাম। কিন্তু তিনি তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন না। আমার স্মরণ নাই ঠিক কত, কিন্তু তিনি আমাকে এক আনা কি দুই আনা জরিমানা করিয়াছিলেন। এ জরিমানার অর্থ—আমাকে মিথ্যুক মনে করা। আমার অত্যন্ত দুঃখ হইল। "আমি মিথ্যা কথা বলি না"—ইহা কেমন করিয়া প্রমাণ করিব? কোনও উপায় ছিল না। মনের যন্ত্রণা মনেই রহিয়া গেল। বুঝিলাম যে, সত্য যে বলিতে চায়, সত্য সে পালন করিতে চায়, তাহার অসাবধান হওয়াও চলে না। আমার পাঠাভ্যাসের সময় অসাবধানতা এই প্রথম ও এই শেষ। আমার অস্পষ্ট স্মরণ আছে যে, শেষে এই দণ্ড মাফ করাইতে আমি সক্ষম হইয়াছিলাম।

ব্যায়াম করা হইতে অবশ্য মুক্তি পাইয়াছিলাম। স্কুলের পর আমাকে যেন বাড়ি আসিতে দেওয়া হয়—পিতার এইরূপ পত্র হেড-মাষ্টারকে দেওয়ায় তিনি আমাকে ব্যায়াম হইতে অব্যাহতি দেন। ব্যায়ামের পরিবর্তে বেড়াইতাম বলিয়া, ব্যায়াম না করার ভুলের দণ্ড আমাকে কখনও ভুগিতে হয় নাই।

এই সময়কার ছাত্রজীবনের দুইটি স্মৃতি উল্লেখযোগ্য। জ্যামিতির মাষ্টার মহাশয় ভাল পড়াইতেন। কিন্তু আমার মাথায় ঢুকিত না।
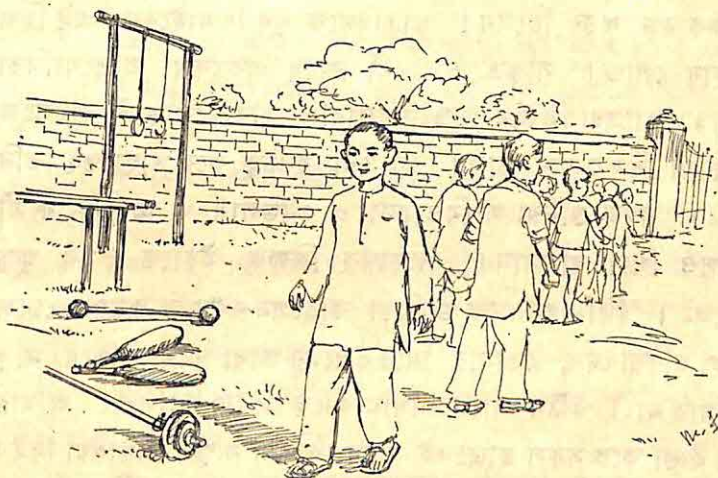
অনেক সময় নিরাশ হইতাম। কখনো কখনো এমনও মনে হইত যে, দুই ক্লাস এক বৎসরে শেষ না করিয়া পুনরায় তৃতীয় শ্রেণীতেই ফিরিয়া যাই। কিন্তু ইহাতে আমার যেমন লজ্জার কথা, তেমনি যে শিক্ষক আমি শ্রম করিব—এই বিশ্বাসে প্রমোশন দিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাঁহাকেও লজ্জায় ফেলা হয়। এই ভয়ে নীচের ক্লাসে নামার কথা ছাড়িয়া দিলাম। চেষ্টা করিতে করিতে যখন ইউক্লিডের ত্রয়োদশ প্রতিজ্ঞা পর্যন্ত আসিলাম তখন হঠাৎ দেখিতে পাইলাম যে,

জ্যামিতি সর্বাপেক্ষা সহজ বিষয়। যেখানে কেবল বুদ্ধিরই সহজ ও সরল প্রয়োগ সেখানে আবার মুশকিল কোথায়? তারপর হইতে জ্যামিতি আমার নিকট সহজ ও সরস বিষয় হইয়া পড়িল।

জ্যামিতিক অপেক্ষাও বেশি মুশকিল হইয়াছিল সংস্কৃতে। জ্যামিতিতে মুখস্থ করার কিছু ছিল না কিন্তু সংস্কৃত তখন আমার কাছে মুখস্থ করারই বিষয় হইয়াছিল। সংস্কৃতও চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ানো আরম্ভ করা হয়। ষষ্ঠ শ্রেণীতে আমি উঠিলাম। সংস্কৃত শিক্ষক বড় শক্ত ছিলেন। ছাত্রদিগকে খুব শিখাইবেন—এই ছিল তাঁহার লোভ। সংস্কৃত ও ফার্সী ক্লাসে একরকম প্রতিযোগিতা ছিল। ছাত্রেরা ভিতরে ভিতরে বলাবলি করিত যে ফার্সী বড় সহজ ও ফার্সী শিক্ষক বড় ভাল। ছাত্রেরা যতটুকু করে তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট। সহজ শুনিয়া আমিও লোভে পড়িলাম ও একদিন ফার্সী ক্লাসেও গিয়া বসিলাম। সংস্কৃতের শিক্ষক ইহাতে ভারি ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি আমাকে ডাকিয়া কহিলেন—"তুমি কাদের ছেলে তাহা বুঝিয়া দেখ, তোমার নিজের ধর্মের ভাষা তুমি শিখিবে না? তোমার যাহা কঠিন লাগে আমার কাছে লইয়া আসিও। আমার তো ইচ্ছা করে সকল ছাত্রকেই ভাল করিয়া সংস্কৃত শিখাইয়া দিই। আরো বেশি শিখিলে ইহাতে খুব রস পাইবে। এরকম হার মানা তোমার উচিত নয়। তুমি আবার আমার ক্লাসে ফিরিয়া এস।" তাঁহার কথা শুনিয়া আমার লজ্জা হইল। শিক্ষকের প্রেমের অপমান করিতে পারিলাম না। আজও আমার আত্মা কৃষ্ণশঙ্কর মাষ্টারের উপকার স্বীকার করিতেছে। তখন যতটুকু সংস্কৃত শিখিয়াছিলাম তাহাও যদি না শিখিতাম, তাহা হইলে আজ সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে যেটুকু রস গ্রহণ করিতে পারিতেছি তাহাও পারিতাম না। আমার এই অনুতাপ রহিয়া গিয়াছে যে, ভাল সংস্কৃত শিখিতে পারি নাই।

কেননা পরে আমি বুঝিয়াছিলাম হিন্দু বালকের সংস্কৃত বেশ ভাল না জানিলে চলে না।

(গান্ধী রচনাসম্ভার প্রথম খণ্ড হইতে সংক্ষেপিত)

অনুশীলনী

১। ব্যায়ামের সহিত শিক্ষার সম্পর্ক কি? তাহা তোমার নিজের ভাষায় বল।

২। "আমার পাঠাভ্যাসে সময় অসাবধানতা এই প্রথম ও এই শেষ"—যে ঘটনাকে উল্লেখ করিয়া এই কথা বলা হইয়াছে তাহা তোমার নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

৩। জ্যামিতি কঠিন লাগার ফলে লেখকের মনে কি কি চিন্তা জাগিয়াছিল?

৪। লেখকের আত্মা কেন কৃষ্ণশঙ্কর মাষ্টারের উপকার স্বীকার করিতেছে?।

৫। "এই সময়কার ছাত্রজীবনের দুইটি স্মৃতি উল্লেখযোগ্য"—স্মৃতি দুইটি কি কি? তাহারা উল্লেখযোগ্য কেন?

৬। অর্থ লিখ:—নিয়মনিষ্ঠ, বাধ্যতামূলক, মজবুত, হাজিরা, অস্পষ্ট, অব্যাহতি, ক্ষুব্ধ, অনুতাপ, নিরাশ।

৭। বাক্য রচনা কর:—শৃঙ্খলাপরায়ণ, অপছন্দ, অন্যতম, অনুপস্থিত, সক্ষম, মুশকিল, অপমান।

৮। কোন্‌টি কি পদ:—শারীরিক, সুগঠিত, অভ্যাস, অসাবধানতা, মিথ্যুক, প্রতিযোগিতা, সহজ, লজ্জা।

[লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সব্যসাচীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার সমগ্র রচনা সাধুভাষায় রচিত। 'আনন্দমঠ' তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' আনন্দমঠ-এর প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে গৃহীত।]

১১৭৬ সালে গ্রীষ্মকালে একদিন পদচিহ্ন গ্রামে রৌদ্রের উত্তাপ বড় প্রবল। গ্রামখানি গৃহময়, কিন্তু লোক দেখি না। বাজারে সারি সারি দোকান, হাটে সারি সারি চালা, পল্লীতে পল্লীতে শত শত মৃন্ময় গৃহ, মধ্যে মধ্যে উচ্চ নীচ অট্টালিকা। আজ সব নীরব। বাজারে দোকান বন্ধ, দোকানদার কোথায় পলাইয়াছে ঠিকানা নাই। আজ হাটবার, হাটে হাট লাগে নাই। ভিক্ষার দিন, ভিক্ষুকেরা বাহির হয় নাই। তন্তুবায় তাঁত বন্ধ করিয়া গৃহপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতেছে, ব্যবসায়ী ব্যবসা ভুলিয়া শিশু ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতেছে, দাতারা দান বন্ধ করিয়াছে, অধ্যাপক টোল বন্ধ করিয়াছে, শিশুও বুঝি আর সাহস করিয়া কাঁদে না। রাজপথে

লোক দেখি না, সরোবরে স্নাতক দেখি না, গৃহদ্বারে মনুষ্য দেখি না, বৃক্ষে পক্ষী দেখি না, গোচারণে গোরু দেখি না, কেবল শ্মশানে শৃগাল-কুক্কুর। * * *

১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ হইল—লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল, দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গাহিল, কৃষক-পত্নী আবার রূপার পৈঁচার জন্য স্বামীর কাছে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে কার্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্য সকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল, যাহার দুই-এক কাহন ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না। প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। তারপর এক সন্ধ্যা আধপেটা করিয়া খাইতে লাগিল, তারপর দুই সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। যে কিছু চৈত্র ফসল হইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইল না। কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্তা, মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব। একেবারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল। বাংলায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল।

লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তারপর কে ভিক্ষা দেয়!—উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তারপরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ি বেচিল। জোতজমা বেচিল। তারপরে মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর ছেলে বেচিতে আরম্ভ

করিল। তারপর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কিনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশ গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

রোগ সময় পাইল—জ্বর, ওলাওঠা, ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষতঃ বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে। কেহ কাহার চিকিৎসা করে না; কেহ কাহাকে দেখে না; মরিলে কেহ ফেলে না। অতি রমণীয় বপু অট্টালিকার মধ্যে আপনাআপনি পচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পালায়।

অনুশীলনী

১। 'মন্বন্তর' কথার অর্থ লিখ। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামকরণ হইয়াছে কেন?

২। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কারণ বর্ণনা কর।

৩। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরে বাংলায় যে দুরবস্থা ঘটিয়াছিল তাহার বর্ণনা দাও।

৪। শব্দার্থ লিখ:—মৃন্ময়, টোল, স্নাতক, মহার্ঘ, দৌরাত্ম্য, কাহন, সরফরাজ, জোত, ইতর, প্রাদুর্ভাব।

৫। এই গদ্যাংশটি সরব পাঠ কর।

বাংলা ১১৭৬ সালে বাংলায় যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল সেই দুর্ভিক্ষ পীড়িত বাংলার দুর্দশার কথা বর্ণিত হয়েছে এই প্রবন্ধে।

হীরা-কুনি

অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর

[ঠাকুর পরিবারের কৃতী সন্তানদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ অন্যতম। তিনি আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার জনক। তাঁহার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে একদিকে ভারতীয় চিত্রশিল্প গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং অন্যদিকে বৈঠকী চালের গল্পের আমেজ সৃষ্টির মধ্য দিয়া বাংলা সাহিত্যে নতুন এক গদ্যরীতি সূচিত হইয়াছে।]

গোয়ালিনীর নাম হীরা, গাইটির নাম কুণি। হীরার একটি এক মাসের ছেলে, গাইটির একটি এক মাসের বাছুর।

হীরা দুধ বেচতে চলে রায়গড়ের পাহাড় ভেঙ্গে বর্গীরাজাকে। কুণি গাইয়ের টাটকা দুধ রাজা খায়, বাছুরটা কাঁদতে থাকে। হীরার মনে কোনদিন ব্যথা বাজে না বাছুরের জন্যে। দুধ দুইবার বেলায় কুণি গাই থেকে থেকে তার বাছুরকে ডাকে। বাছুর ছুটে আসতে চায় দুধ খেতে, হীরা তাকে ফিরিয়ে দেয়, খোঁটায় বেঁধে রাখে। বাছুর তার মাকে পায় না, কাঁদতে থাকে দুধের জন্যে। হীরা সেদিকে নজরই দেয় না, সকাল বিকাল দুধ দুয়ে নিয়ে যায় বেচতে

বর্গীর কেল্লায়, সেখান থেকে ফিরে আসে সন্ধ্যার আগে। প্রথমে নিজের ছেলেকে দুধ খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়, তারপর বাছুরকে নিয়ে কুণির কাছে ধরে, বাছুর তার মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কিন্তু দুধ পায় একটুখানি। কুণি বাছুরের গা চেটে তাকে ঘুম পাড়ায়। বাছুর থাকে উপবাসী, দুধ খায় বর্গীরাজা। এইভাবে দিন যায়।

একদিন হীরা গেল দুধ বেচতে কেল্লায়, সেখানে দুধের দাম চোকাতে রাজার খাজাঞ্চীও করলে দেরি, সন্ধ্যার ঘড়ি পড়লো, কেল্লার ফটক ঝণাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল। হীরা বললে—"দোর খোল।" সেপাই বললে—"হুকুম নেই।" হীরার প্রাণ ছটফট করে ছেলের জন্যে। সে কেঁদে বলে—"বাছা আমার না খেয়ে রয়েছে, পায়ে ধরি দোর খোল।" বর্গীরাজার কড়া পাহারা—দোর খোলে না। হীরার বুক টনটন করে ছেলেকে দুধ দিতে, দোরের শিকল দিয়ে নাড়া দেয়, বলে—"একটিবার খোলরে খিল!" লোহার তালা ঝনঝন করে জানায়—হুকুম নেই।

বেলা পড়লো, সন্ধ্যাতারা কেল্লার মাঝখানে দেবতার ঠিক উপরে দেখা দিলে। রাতের পাখিরা ডানা মেলে উড়ে চলল বাসায়, হীরা কেঁদে বললে—"ওরে ডানা পাই ত উড়ে যাই বাছার কাছে—সে যে না খেয়ে মরে!" পাহাড়ের নীচেই হীরার ঘর, সেখান থেকে কুণি গাই তার বাছুরকে ডাক দিচ্ছে শোনা গেল, হীরা দুধের খালি কলসী আছড়ে ভেঙ্গে উঠে দাঁড়ালো; কোমর বেঁধে পথের সন্ধানে চলল।

রায়গড়ের পুরানো বুরুজ, তারি ধারে পাহাড় খানিক ধসে গেছে। একটা অশ্বত্থ গাছ তার উপর ঝুঁকে পড়েছে—সেইখানটায় অর্ধেক রাতে চাঁদের আলো পড়লো। হীরা দেখলে, পাথরগুলো কুমীরের দাঁতের মত খোঁচা খোঁচা ঝকঝক করছে। হীরা সেই পথে আস্তে

আস্তে নামতে থাকলো—একটির পর একটি পাথরে পা রেখে, তারপর এক পাকদণ্ডি বেয়ে হীরা নেমে এল আপনার ঘরে। তখন রাত ফুরিয়ে সকাল হচ্ছে—ছেলেটা কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে গেছে। হীরা ঘুমন্ত ছেলেকে বুকে জড়িয়ে দুধ দিতে লাগলো—দড়ি ছিঁড়ে

কুণির উপবাসী বাছুর দুধ খেতে থাকলো। হীরা সেদিন তাকে বাঁধলো না, তার মা'র কাছ থেকে সরিয়ে দিলে না।

বেলা হলো। রায়গড়ের বর্গীরাজা ঘুম ভেঙ্গে দুধের জন্য ডাকাডাকি করতে লাগলেন। হীরা আজ দুধ আনে নি। সেপাই ছুটলো হীরার ঘরে দুধ আনতে, হীরা বললে—"দুধ নেই, শুকিয়ে

গেছে।” বর্গীরাজার সেপাই সে, শুনবে কেন? হীরাকে ধরে নিয়ে গেল কেল্লায়। সেখানে রাজা শুনলেন সব কথা, হীরাকে তার গ্রামখানা জায়গীর দিলেন—আর যে পথে হীরা প্রাণ হাতে করে নেমে গিয়েছিল ছেলের কাছে, সেই দুর্গম পথটার নাম দিলেন বর্গীরাজা, “হীরা-কুণি।”

হীরা দুধ বেচা ছেড়ে চাষবাসের কাজে লেগে গেল।

অনুশীলনী

১। হীরা কে? কুণি কে? হীরার সহিত কুণির মিল কোথায়?

২। হীরা কোথায় দুধ বেচতে যেত? একদিন ফিরবার সময় কেল্লা ফটক বন্ধ দেখল কেন?

৩। সেই দুর্গম পথটার নাম দিলেন বর্গীরাজা “হীরা-কুণি”। কোন পথের কথা এখানে বলা হয়েছে? পথটি দুর্গম কেন? পথের নাম হীরা-কুণি হ'ল কেন?

৪। শব্দার্থ লিখ ঃ—খাজাঞ্চী, ফটক, পাকদণ্ডি, দুর্গম, ঘুমন্ত, জায়গীর।

৫। বাক্য রচনা কর ঃ—বৃথা, উপবাসী, ঝনাৎ, টনটন, ঝকঝক।
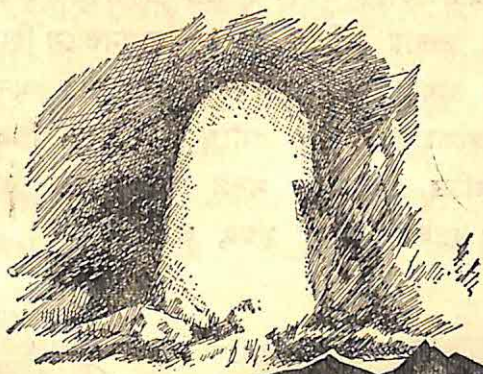
অমরনাথের পথে

প্রবোধ কুমার সান্যাল

[প্রবোধকুমার সান্যাল—লেখক। কিন্তু ইহা হইতেও তাঁহার বড় পরিচয় এই যে, তিনি একজন পর্যটক। তপোময় তুষারতীর্থে তাঁহার ডাক পড়িয়াছিল। দেবতাত্মা হিমালয় তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। সেই আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া তিনি চলিয়াছেন হিমালয়ের তীর্থে তীর্থে।]

আমি যাচ্ছিলাম অমরনাথে। মনে ছিল হিমালয়ের অভিনবত্বের লোভ। মন্দিরের বদলে এবার গুহা। বিগ্রহ নয়, প্রস্তর শিলা নয়,—একটা তুষার-আয়তন। ধীরে ধীরে সেটা নাকি চান্দ্রমাসের যোগ অনুসারে শিবলিঙ্গের আকার ধারণ করে। স্বামী বিবেকানন্দ সেই লিঙ্গ দর্শন করে এমনভাবে একদা সমাধিস্থ হন যে তীর্থ-যাত্রীদের অনেকে গিয়ে তাঁকেই অমরনাথ বলে ঠাওরান। তখন মহারাজা প্রতাপ সিংহের আমল। আরও একটা বড় লোভ, এদিকের হিমালয়ের চেহারা ও চরিত্রের বৈচিত্র্য। হিমালয় কখনও ধূসর, উষর, কখনও বর্বর, কখনও বা রুক্ষ। কখনও সে রুদ্রলোচন,

কখনও বা নিমীলিতনেত্র। তাকে কখনও দেখলে জ্বালা করে চোখ, কখনও চোখ ছুটো মধুর তন্দ্রায় জড়িয়ে আসে। কখনও সে হিংস্র শার্দূলে, ভয়াল ভল্লুকে অথবা উন্মত্ত হস্তীতে ভীষণ, আবার কখনও সে গৈরিকবাস সন্ন্যাসীদলের তপোবনের প্রান্তে সামগানে মুখরিত। এখানে হিমালয়ের বিচিত্র চেহারা। সমগ্র কাশ্মীর এবং তার চতুর্বেষ্টনী পর্বতমালার বহুলাংশ হলো মৃন্ময়, প্রস্তরময় নয়। এ

চেহারা আমার কাছে নতুন। কাশ্মীর বড় কোমল—এত কোমল আগে মনে হয় নি। কিন্তু সে কথা এখন থাক। এখন থেকে হিমালয়ের উত্তর দিকে বিস্তার শুরু হলো—সোজা উত্তরে। তিব্বতকে ডানদিকে রেখে, উত্তর হিমালয় চলে গেছে কৃষ্ণগঙ্গা পেরিয়ে কারাকোরাম পর্বতমালা অর্থাৎ কৃষ্ণগিরির শেষ পর্যন্ত।

আশেপাশে দেখছি অসংখ্য পায়ে-চলা পথ চলে গেছে উত্তরে ও পূর্বে। কোনোটা গেছে কোলাহাই হিমবাহের দিকে, কোনোটা লাডাকে, কোনোটা লিডারবৎ ছড়িয়ে সিন্ধু উপত্যকায়; কোনোটা তিব্বতে, কোনোটা বা দক্ষিণ লাডাক হেমিস গুম্ফার দিকে—যেখানে যীশুখ্রীষ্টের ভারত-ভ্রমণের সমস্ত তথ্য প্রমাণাদি গুম্ফার মধ্যেও আজও সযত্ন রক্ষিত আছে। অনেক পথ অপ্রত্যক্ষ, সেগুলি পাহাড়ী গুজরদের করায়ত্ত।

আমরা যেসব অঞ্চলকে আমাদের অভ্যস্ত সংস্কারের দিক থেকে দুঃসাধ্য ও অগম্য বলি, একজন স্থানীয় মেষপালক তা বলে না। তারা অনায়াসে আনাগোনা করে পাহাড় থেকে পাহাড় পেরিয়ে তিব্বতে লাডাকে, পামীরে, কারাকোরামের গিরিসংকটে অথবা মধ্য-এশিয়ায়। কিন্তু এই পহলগাঁও থেকে প্রত্যক্ষ একটি পথ নীলগঙ্গার ধারে ধারে গেছে শেষনাগের দিকে—যেখানে শেষনাগের বিশাল সরোবর। যেমন শতদ্রু কিংবা সিন্ধুনদের তীর ধরে গেলে পাওয়া যাবে মানস সরোবর। কিন্তু কারো পক্ষে সেই নদীপথ ধরে যাওয়া সম্ভব নয়। আমরা যাব শেষনাগের দিকে, শেষনাগের পথ ধরে গিরিসংকটের ভিতর দিয়েই অমরনাথের উদ্দেশ্যে আমাদের যাত্রাপথ। অনেকে বলে অমরনাথ এখান থেকে মাত্র তিরিশ মাইল, অনেকে বলে আরও কম। অর্থাৎ মোটামুটি তিনটি পর্বতশ্রেণী পেরিয়ে গেলে আমরা পৌঁছতে পারবো। আমরা যাবো উত্তর-পূর্ব পথে। আমি নিজের হিসাবে পাই, দেড়দিন অথবা দু'দিনে পৌঁছবো। কিন্তু আমার পাণ্ডা পণ্ডিত বদরীনাথ বলে, না, আপনারা চারিদিনের দিন পৌঁছবেন, তার আগে পারবেন না। তাঁর কথায় কিছু বিস্ময়বোধ করেছিলুম। তখন বুঝতে পারি নি এ-পথের ক্ষেপ আছে, আবশ্যিক বিরতি আছে এবং পথের অনুশাসন মেনে চলতে আমরা বাধ্য।

অনুশীলনী

১। অমরনাথ কি ও কোথায় ?

২। হিমালয়ের চেহারা ও চরিত্রের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে লেখক যাহা বলিয়াছেন তাহা তোমার নিজের ভাষায় বল।

৩। লেখক পহলগাঁও থেকে কোন্ দিকে পথ ধরে অমরনাথে যেতে চান ?

৪। টীকা লিখ :—হিমবাহ, লাডাক, শেষনাগ, যীশুখ্রীষ্ট, তিব্বত।

৫। শব্দার্থ লিখ :—বিগ্রহ, চান্দ্রমাস, ধূসর, উষর, রুক্ষ, রুদ্রলোচন, শার্দূল, বিরতি, ক্ষেপ, মৃন্ময়।

৬। বাক্য রচনা কর :—নিমীলিতনেত্র, অগম্য, অপ্রত্যক্ষ, আবশ্যিক, বিস্ময়বোধ, অভিনবত্ব, অভ্যস্ত, তন্দ্রা।

৭। শূন্যস্থান পূরণ কর :—কখনও সে হিংস্র ——, —— ভল্লুকে অথবা —— হস্তীতে ভীষণ, আবার কখনও সে —— সন্ন্যাসীদের তপোবনের প্রান্তে —— মুখরিত।

[পরাধীন ভারতবর্ষে বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে নানা প্রকার সংস্কার সাধনে সে যুগে যাঁহারা আবির্ভূত হইয়াছিলেন মহাত্মা রামমোহন রায় ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন নব ভারতের অগ্রদূত। ধর্ম ও কুসংস্কারের গোঁড়ামি হইতে ভারতকে মুক্ত করিবার জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করিয়া ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছেন।]

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামের অভিজাত জমিদার বংশে রামমোহন রায়ের জন্ম। পিতার নাম রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা তারিণী দেবী। রামমোহনের প্রপিতামহ বাংলার রাজসরকারে কাজ করিয়া "রায়-রায়ান" উপাধি পান। সেই অবধি এই পরিবার 'রায়' পদবীতে পরিচিত।

সেই সময় অবস্থাপন্ন হিন্দুঘরের ছেলেরা সংস্কৃত ও ফারসী শিখিলেই উচ্চশিক্ষিত বলিয়া গণ্য হইত। সেইজন্য বাল্যকালে গুরু-মহাশয়ের পাঠশালায় পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাড়িতে ফারসী শিখেন। পিতা তাঁহাকে আরবী শিখিবার জন্য পাটনায় এবং শেষে সংস্কৃত শিখিবার জন্য কাশীতে পাঠাইয়াছিলেন। মেধাবী রামমোহন মাত্র পনের বৎসর বয়সেই অসামান্য পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। পরে জন্ ডিগ্‌বী সাহেবের কথায় মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে ইংরাজী

ভাষা শিখিয়া যে কোন ইংরাজের মতই চমৎকার ইংরেজী বলিতে ও লিখিতে শিখিয়াছিলেন।

লেখাপড়া শিখিয়া তাঁহার অভিমত হইল ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। সেইজন্য তিনি মূর্তিপূজার বিরোধী হইলেন। ফলে পিতা এই বিধর্মী ছেলেকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিলেন। রামমোহন ভারতে সত্য-রূপ দেখিতে পথে নামিলেন।

তাঁহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠল—কুলীনের কু-প্রথা, সতীদাহের বীভৎস রূপ, অজ্ঞতার বেদনা, মাতৃভাষার দৈন্য, ধর্মের গোঁড়ামি ও শাস্ত্রের নামে মিথ্যাচার। এই সকল বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করিতে জীবনপণ করিলেন।

কর্মবীর রামমোহন নিজের বুদ্ধি ও উদ্যমের সাহায্যে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। রংপুরে চাকুরি ও ব্যবসায় হইতে তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ছিল পিতার উইলসূত্রে প্রাপ্ত জমিদারী। কাজেই স্বদেশে থাকাকালীন তাঁহার আর্থিক অবস্থা কোনদিনই খারাপ ছিল না।

রংপুর হইতে কলিকাতায় আসিয়াই তিনি সংগ্রাম শুরু করিলেন। এখানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া ধর্মসভা, আলোচনা, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ দ্বারা তিনি যে উদার ধর্মমত প্রচার করিলেন তাহার মূলমন্ত্র হইল "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। সত্য ও যুক্তির দ্বারা তিনি হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীশ্চানকে আক্রমণ করিলেন। পণ্ডিত, মৌলবী ও মিশনারীরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে কেহই তাঁহার যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করিতে পারিলেন না।

শিক্ষা-সংস্কারে ব্রতী হইয়া তিনি বুঝিলেন যে নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইউরোপই পৃথিবীকে পথ দেখাইয়াছে। সেইজন্য তিনি দেশে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার পরোক্ষ

প্রেরণায় প্রেসিডেন্সী কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল। আর তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে স্কটল্যাণ্ডের বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী আলেকজাণ্ডার ডাফের সহযোগিতায় যে বিদ্যায়তন সৃষ্ট হইয়াছিল তাহাই বর্তমানের স্বনামধন্য স্কটিশচার্চ কলেজ।

রামমোহন কর্মব্যস্ত মনীষী। সাহিত্য রচনার সময়ও তাঁহার ছিল না। তাঁহার সমস্ত রচনাই ধর্ম ও সমাজসংস্কারমূলক। তথাপি বাংলা সাহিত্যে তাঁহার স্মরণীয় দান আছে। রামমোহনকে বাংলা গদ্যের অন্যতম স্রষ্টা বলা চলে। সহজ সুন্দর প্রাণের ভাষা লইয়া তিনি বাংলা গদ্যের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে 'তুহফাৎ-উল-মুয়াহ্‌হিদীন', 'বেদান্ত গ্রন্থ', 'বেদান্ত-সার', 'ভট্টাচার্যের সহিত বিবাদ', 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক নিবর্তকের সংবাদ', 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রামমোহনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ সতীদাহ প্রথা বন্ধ করা। এই দেশের স্বার্থপর পুরুষেরা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া সতীদাহ প্রথা নামে—মৃত স্বামীর চিতায় জীবন্ত স্ত্রী বলপূর্বক দাহ করিয়া নারীহত্যার আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছিল। রামমোহনের ঐকান্তিক চেষ্টায় লর্ড বেন্টিঙ্ক তাহা নিষিদ্ধ করিয়া আইন পাস করিয়াছিলেন।

ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে দিল্লীতে দ্বিতীয় আকবর নামে একজন বাদশাহ ছিলেন। তাঁহার কতকগুলি অধিকার কোম্পানী স্বীকার করিতে অসম্মত হওয়ায় বাদশাহকে ইংল্যাণ্ডের রাজার কাছে দূত পাঠাইতে হয়। বাদশাহ রামমোহনকে 'রাজা' উপাধি দিয়া দূত করিয়া ইংল্যাণ্ডে পাঠাইয়াছিলেন।

বিলাতের পথে কেপ টাউনে তাঁহার একটি পা ভাঙ্গিয়া যায়। বিলাতে সুনামের সহিত দীর্ঘদিন কাটাইলেও তাঁহার শরীর কখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই। তদুপরি তাঁহার গচ্ছিত অর্থ যে ব্যাঙ্কে ছিল

তাহা ফেল পড়ায় তিনি অর্থাভাবে পড়েন। ঋণ ও দুশ্চিন্তায় তিনি অধিকতর অসুস্থ হইয়া পড়েন। অবশেষে ১৮৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর ভারত-পুরুষ রামমোহনের জীবনে যবনিকা নামিয়া আসে বিলাতের মাটিতেই।

এমন অসামান্য ব্যক্তিত্ব, এমন পাণ্ডিত্য আর এত বড় কর্মশক্তি লইয়া তাঁহার পরে আর একজনও ভারতে মানুষ জন্মিয়াছে কিনা সন্দেহ।

সঙ্কলক

অনুশীলনী

১। রামমোহনের জীবনী বর্ণনা কর।

২। কে কখন রামমোহনকে 'রাজা' উপাধি দিয়াছিলেন ?

৩। ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁহার সংস্কার বর্ণনা কর।

৪। তাঁহার রচিত কয়েকটি পুস্তকের নাম কর।

৫। তিনি কোন্ কোন্ বিরুদ্ধ শক্তির সহিত সংগ্রামে জীবনপণ করিয়াছিলেন ?

৬। অর্থ লিখ :—আজীবন, আবির্ভূত, স্মরণীয়, প্রপিতামহ, বীভৎস, অজ্ঞতা, উইল, একমেবাদ্বিতীয়ম্, মৌলবী, এতদ্ব্যতীত, যবনিকা।

৭। কোন্‌টি কি পদ ?—মেধাবী, অজ্ঞতা, দৈন্য, বিখ্যাত, মনীষী, নিষিদ্ধ, সুস্থ, পাণ্ডিত্য, গচ্ছিত।

কারাকাহিনী

অরবিন্দ ঘোষ

[ভারতমাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। পরবর্তী জীবনে তিনি 'ঋষি অরবিন্দ' হিসাবেই বেশি খ্যাত হন। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করিয়া ইংরাজের নিকট সন্ত্রাসবাদী হইয়া উঠেন। পরে ধরা পড়িয়া তাঁহাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। কারাকাহিনী সেই সময়েরই সরস রচনা।]

আমার নির্জন কারাগৃহটি নয় ফুট দীর্ঘ, পাঁচ-ছয় ফুট প্রস্থ ছিল। ইহার জানালা নাই, সম্মুখভাগে বৃহৎ লোহার গরাদ, এই পিঞ্জরই আমার নির্দিষ্ট বাসস্থান হইল। ঘরের বাহিরে একটি ক্ষুদ্র উঠান, পাথরের জমি, ইটের উচ্চ দেওয়াল, সামনে কাঠের দরজা। সেই দরজার উপরিভাগে মানুষের চক্ষুর সমান উচ্চতায় ক্ষুদ্র গোলাকার রন্ধ্র, দরজা বন্ধ হইলে সান্ত্রী এই রন্ধ্রে চক্ষু লাগাইয়া সময় সময় দেখে, কয়েদী কি করিতেছে। কিন্তু আমার উঠানের দরজা প্রায়ই খোলা থাকিত। এইরূপ ছয়টি ঘর পাশাপাশি, সেইগুলিকে ছয় ডিক্রী বলে। ডিক্রীর অর্থ বিশেষ সাজার ঘর—বিচারপতি বা জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের হুকুমে যাহাদের নির্জন কারাবাসের দণ্ড নির্ধারিত হয় তাহাদেরই এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বরে থাকিতে হয়। এই নির্জন কারাবাসেরও কম ও বেশি আছে। যাহাদের বিশেষ সাজা

হয়, তাহাদের উঠানের দরজা বন্ধ থাকে; মনুষ্য সংসার হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়া সান্ত্রীর চক্ষু ও পরিবেশনকারী কয়েদীর দু'বেলায় আগমন তাহাদের জগতের সঙ্গে একমাত্র সম্বন্ধ। আমা হইতেও হেম চন্দ্র দাস সি. আই. ডি-র আতঙ্কস্থল বলিয়া তাহার জন্য এই ব্যবস্থা হইল। এই সাজার উপরও সাজা আছে,—হাতে-পায়ে কড়া ও বেড়ি পরিয়া নির্জন কারাবাসে থাকা। এই চরম শাস্তি কেবল জেলের শান্তিভঙ্গ করা বা মারামারির জন্য নয়, বার বার খাটুনিতে ত্রুটি হইলেও এই শাস্তি হয়। নির্জন কারাবাসের মকদ্দমার আসামীকে শাস্তিস্বরূপ এইরূপ কষ্ট দেওয়া নিয়মবিরুদ্ধ তবে স্বদেশী বা "বন্দে মাতরম্"—কয়েদী নিয়মের বাহিরে, পুলিশের ইচ্ছায় তাহাদের জন্যও সুবন্দোবস্ত হয়। আমাদের বাসস্থান তো এইরূপ ছিল, সাজ-সরঞ্জামের সম্বন্ধেও আমাদের সহৃদয় কর্তৃপক্ষ আতিথ্যসৎকারের ত্রুটি করেন নাই। একখানা থালা ও একটি বাটি উঠানকে সুশোভিত করিত। উত্তমরূপে মাজা হইলে এই আমার সর্বস্ব স্বরূপ থালা বাটির এমন রূপার ন্যায় চাকচিক্য হইত যে, প্রাণ জুড়াইয়া যাইত এবং সেই নির্দোষ কিরণময় উজ্জ্বলতার মধ্যে "স্বর্গজগতে" নিখুঁত—ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের উপমা পাইয়া রাজভক্তির নির্মল আনন্দ অনুভব করিতাম। দোষের মধ্যে থালাও তাহা বুঝিয়া আনন্দে এত উৎফুল্ল হইত যে, একটু জোরে আঙুল দিলেই তাহা আরবীস্থানের ঘূর্ণমান দরবেশের ন্যায় মণ্ডলাকারে নৃত্য করিতে থাকিত, তখন এক হাতে আহার করা, এক হাতে থালা ধরিয়া থাকা ভিন্ন উপায় ছিল না। নচেৎ ঘুরপাক খাইতে খাইতে জেলের অতুলনীয় মুষ্টান্ন লইয়া তাহা পলাইয়া যাইবার উপক্রম করিত। থালা হইতে বাটিটাই আরও প্রিয় ও উপকারী জিনিস ছিল। ইহা জড়পদার্থের মধ্যে যেন ব্রিটিশ সিভিলিয়ান। সিভিলিয়ানের যেমন

সর্বকার্যে স্বভাবজাত নৈপুণ্য ও যোগ্যতা আছে, জজ, শাসনকর্তা, পুলিশ, শুল্কবিভাগের কর্তা, মিউনিসিপ্যালিটির অধ্যক্ষ, শিক্ষক, ধর্মোপদেষ্টা, যাহা বল, তাহাই বলিবামাত্র হইতে পারে,—যেমন তাঁহার পক্ষে তদন্তকারী, অভিযোগকর্তা, পুলিশ, বিচারক, এমন কি সময় সময় বাদীর পক্ষের কাউন্সিলারও এক শরীরে একসময়ে প্রীতি-সম্মিলন হওয়া সুখসাধ্য, আমার আদরের বাটিরও তদ্রূপ। বাটির জাত নাই, বিচার নাই, কারাগৃহে যাইয়া যে বাটিতে জল নিয়া শৌচক্রিয়া করিলাম, সেই বাটিতেই মুখ ধুইলাম, স্নান করিলাম, অল্লক্ষণ পরে আহার করিতে হইল, সেই বাটিতেই ডাল বা তরকারি দেওয়া হইল, সেই বাটিতেই জল পান করিলাম এবং আচমন করিলাম। এমন সর্বকার্যক্ষম মূল্যবান বস্তু ইংরাজের জেলেই পাওয়া সম্ভব। বাটি আমার এই সকল সাংসারিক উপকার করিয়া যোগসাধনের উপায় স্বরূপও হইয়া দাঁড়াইল। ঘৃণা পরিত্যাগের এমন সহায় ও উপদেষ্টা কোথায় পাইব? নির্জন কারাবাসের প্রথম পালার পরে যখন আমাদের একসঙ্গে রাখা হয়, তখন আমার সিভিলিয়ানের অধিকার পৃথকীকরণ হয়,—কর্তৃপক্ষেরা শৌচক্রিয়ার জন্য স্বতন্ত্র উপকরণের বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু একমাসকালে এতদ্দ্বারা এই অযাচিত ঘৃণা সংযম শিক্ষালাভ হইল।

অনুশীলনী

১। লেখকের কারাবাসের দুঃখের কাহিনী নিজের ভাষায় লিখ।

২। বাটিকে লইয়া লেখক যে সরস কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন তাহা তোমার নিজের ভাষায় লিখ।

৩। অর্থ লিখ :—গরাদ, পিঞ্জর, রন্ধ্র, সান্ত্রী, মণ্ডলাকার, নৈপুণ্য, তদন্তকারী, উপদেষ্টা, স্বতন্ত্র, সংযম, সাজা।

৪। বাক্য রচনা কর :—নির্জন, আতিথ্যসৎকার, উপমা, অতুলনীয়।

৫। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :—মুষ্টান্ন, ধর্মোপদেষ্টা, মণ্ডলাকার।
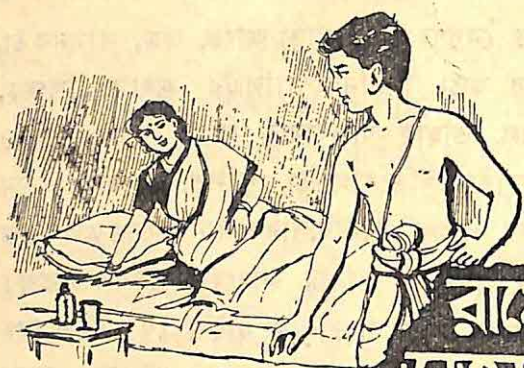
[শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের অপরাজেয় কথাশিল্পী। তাঁহার উপন্যাসগুলিতে বাংলার সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজের হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার অপূর্ব সাহিত্যরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার উপন্যাসে এমন অনেক চরিত্র আছে, যাহারা সমাজের চোখে পাপী এবং অপরাধী, কিন্তু শরৎচন্দ্রের সত্যদৃষ্টির আলোকে তাহারা অনেক সাধু ও পুণ্যবান্ অপেক্ষা মহৎ গুণের অধিকারী।

'রামের ডাক্তার ডাকা' অংশটি 'রামের সুমতি' হইতে গৃহীত।]

রামলালের বয়স কম ছিল, কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি কম ছিল না। গ্রামের লোকে তাহাকে ভয় করিত। অত্যাচার যে তাহার কখন কোন্ দিক দিয়া কিভাবে দেখা দিবে, সে কথা কাহারও অনুমান করিবার জো ছিল না।

এ বৎসর চারিদিকে অত্যন্ত জ্বর হইতেছিল। নারায়ণীও (রামের বৌদিদি) জ্বরে পড়িলেন। তিন-চারিটা গ্রামের মধ্যে একমাত্র খানিকটা-পাস করা ডাক্তার নীলমণি সরকারের এক টাকা ভিজিট দু'টাকায় চড়িয়া গেল এবং তাঁহার কুইনিনের পুরিয়া, আরারুট ময়দা-সহযোগে সুখাদ্য হইয়া উঠিল। সাতদিন কাটিয়া গেল, নারায়ণীর জ্বর ছাড়ে না।

বাড়ির দাসী নৃত্যকালী ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আজ তাঁকে ভিন্ গাঁয়ে যেতে হবে—সেখানে চার টাকা ভিজিট—আসতে পারবেন না।

রামলাল উঠানের একধারে পিয়ারাতলায় বসিয়া পাখির খাঁচা তৈরী করিতেছিল, উঠিয়া আসিয়া বলিল, আমি যাচ্ছি।

রাম নীলমণি ডাক্তারের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তার তখন ডিস্‌পেন্‌সারিতে অর্থাৎ একটা ভাঙ্গা আলমারির

সামনে একটা ভাঙ্গা টেবিলে বসিয়া নিক্তি-হাতে ঔষধ ওজন করিতেছিলেন। চার-পাঁচজন রোগী হাঁ করিয়া তাহাই দেখিতেছিল। ডাক্তার আড়চোখে চাহিয়া নিজের কাজে মন দিলেন।

রাম মিনিটখানেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বৌদির জ্বর সারে না কেন?

ডাক্তার নিক্তিতে চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, আমি কি করব—ওষুধ দিচ্ছি—।

ছাই দিচ্ছ! পচা ময়দার গুঁড়োতে অসুখ ভাল হয়!

কথা শুনিয়া নীলমণি ওজন নিক্তি সব ভুলিয়া চোখ রাঙা করিয়া বাক্যশূন্য হইয়া চাহিয়া রহিলেন। এত বড় শক্ত কথা মুখে আনিবার স্পর্ধা যে সংসারের কোন মানুষের থাকিতে পারে তিনি তাহা জানিতেন না।

ক্ষণেক পরে গর্জিয়া উঠিলেন, পচা ময়দার গুঁড়ো তবে নিতে আসিস কেন রে? তোর দাদা পায়ে ধরে ডাকতে পাঠায় কেন রে?

রাম বলিল, এদিকে ডাক্তার নেই তাই ডাকতে পাঠায়। থাকলে পাঠাত না।

লোকগুলো স্তম্ভিত হইয়া শুনিতেছিল, তাহাদের পানে চাহিয়া দেখিয়া সে পুনর্বার বলিল, তুমি ছোট জাত, বামুনের মান-মর্যাদা জান না তাই বলে ফেললে, পায়ে ধরে ডাকতে পাঠায়! দাদা কারো পায়ে ধরে না। আসবার সময় বৌদিদি মাথার দিব্যি দিয়ে ফেলেছে, নইলে দাঁতগুলা তোমার সত্যই ভেঙ্গে দিয়ে ঘরে যেতুম। তা শোন, ভাল ওষুধ নিয়ে এখুনি এস, দেরি ক'রো না। আজ যদি জ্বর না ছাড়ে, ঐ যে সামনে কলমের আমবাগান করেছ, বেশি বড় হয়নি তো—কুড়ুলের এক এক ঘায়েই কাত হবে—ওর একটিও আজ রাত্তিরে থাকবে না। কাল এসে শিশি বোতল গুঁড়ো করে দিয়ে যাব। বলিয়াই সে চলিয়া গেল।

ডাক্তার নিক্তি ধরিয়া আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন।

একজন বৃদ্ধ তখন সাহস করিয়া বলিল, ডাক্তারবাবু আর বিলম্ব ক'রো না। ভাল ওষুধ লুকোনো-টুকোনো যা আছে, তাই নিয়ে যাও। ও রামঠাকুর যা বলে গেছে তা ফলাবে, তবে ছাড়বে।

ডাক্তার নিক্তি রাখিয়া বলিল, আমি থানার দারোগার কাছে যাব, তোমরা সব সাক্ষী।

যে বৃদ্ধ পরামর্শ দিতেছিল, সে বলিল, সাক্ষী। সাক্ষী কে দেবে বাবু? আমার তো কুইনাইন খেয়ে কান ভোঁভোঁ করতেছে—রামঠাকুর কি যে বলে গেল, তা শুনতেও পেলুম না। আর দারোগা করবে কি বাবু? ও দেবতাটি দেখতে ছোট, কিন্তু ওনার বাগ্দী ছোকরার দলটি ছোট নয়। ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারলে থানার লোক দেখতে আসবে না, দারোগাবাবু এক আঁটি খড় দিয়েও উপকার করবে না। ওসব আমরা পারব না—ওনাকে সবাই ডরায়। তার চেয়ে যা বলে গেছে কর গে। [সংক্ষেপিত]

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অনুশীলনী

১। 'রামের ডাক্তার ডাকা' হইতে রামের সম্বন্ধে তোমার যা ধারণা তাহা লিখ।

২। গদ্যাংশটির সরব পাঠ কর।

৩। শব্দার্থ লিখ :—ভিন, নিক্তি, নিবদ্ধ, স্পর্ধা, স্তম্ভিত, আড়ষ্ট।

[ভূ-গোলকের উত্তর ও দক্ষিণ সীমা 'মেরু' নামে পরিচিত। মেরু অঞ্চল দুর্গম। ক্যাপ্টেন স্কট্ নামে এক দুঃসাহসিক অভিযাত্রী দক্ষিণমেরুর রহস্য আবিষ্কার করিতে গিয়া মৃত্যুবরণ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার সেই অভিযান ও আবিষ্কারের করুণ কাহিনী লেখক শশাঙ্কশেখর বাগচির বর্ণনায় এখানে সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।]

পৃথিবীর উত্তর সীমায় উত্তরমেরু ও দক্ষিণ সীমায় দক্ষিণমেরু। মেরুতে সর্বদাই অত্যন্ত শীত—সমস্ত বৎসর ধরিয়া সহস্র সহস্র ক্রোশ জুড়িয়া কেবল বরফ জমিয়া আছে। একসঙ্গে দুই মাস হয়ত সূর্যের আলোর দেখাই পাওয়া গেল না, যখন সূর্য দেখা গেল তখনও সূর্যের আলো বড়ই ক্ষীণ, উত্তাপ বড়ই মৃদু। সীল, পেঙ্গুয়িন প্রভৃতি কয়েকটি প্রাণী ছাড়া সেখানে এত শীতে আর কোন জীব-জন্তু বাস করিতে পারে না। গাছপালা প্রভৃতি কোনও উদ্ভিদ সেখানে জন্মিতে পারে না। মেরুতে প্রায়ই ঝড় হয়—তাহাকে

তুষার-ঝটিকা বলে। সে অতি ভীষণ ব্যাপার। তীব্রভাবে বাতাস বহিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে তুষারপাত হইতে থাকে। এই ঝড়ের মুখে পড়িলে আর রক্ষা নাই। শীতের বাতাসে, তুষারের স্পর্শে হাত-পা অসাড় হইয়া যায়, দেহের রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থামিয়া যায়।

ক্যাপ্টেন স্কট্ নামে একজন সাহসী ইংরেজ দক্ষিণমেরু আবিষ্কার করিবার জন্য বাহির হইয়াছিলেন। মেরুর প্রান্তে উপস্থিত হইয়া ফিরিবার পথে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণমেরু সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহের জন্য দক্ষিণ-মেরুতে একদল লোক পাঠান হইবে স্থির করা হইল। ক্যাপ্টেন স্কট্ তখন নৌবিভাগের একজন পদস্থ কর্মচারী। তাঁহাকে এই অভিযানের দলপতি নিযুক্ত করা হইল। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি তিনি সদল-বলে জাহাজে চড়িয়া দক্ষিণমেরুর দিকে যাত্রা করিলেন। দক্ষিণমেরু হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ইংলণ্ডে আসিলেন। সেবার মেরুর প্রান্ত পাঁচশত মাইলও ব্যবধানে ছিল না। তাঁহার পূর্বে কেহই আর এতদূর যাইতে পারে নাই। মেরুভ্রমণ করিবার পর ফিরিয়া আসিয়া তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে লোকে অনেক অনেক নতুন সংবাদ জানিতে পারিল। পূর্বে লোকের ধারণা ছিল যে, দক্ষিণমেরুর ও উত্তরমেরুর ন্যায় একটি মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত। কিন্তু স্কট্ ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে, দক্ষিণমেরুর দিকে একটি প্রকাণ্ড মহাদেশ রহিয়াছে। সেই বিস্তীর্ণ মহাদেশের উপর দশ-পনের হাজার ফুট উচ্চ পাহাড়ের শ্রেণী পর পর চলিয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে বরফের নদী বহিয়া যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে চিরতুষারে আবৃত উপত্যকা। পর্বতশৃঙ্গ, নদী, উপত্যকা সমস্তই বরফে আচ্ছন্ন। এই পথে চলিতে চলিতে

তিনি অনেকবার অনেক বিপদে পড়িয়াছিলেন। একবার এক পাহাড়ের উপর হইতে স্কট্ দুইজন সঙ্গী লইয়া বরফের নদী দিয়া নীচে নামিতেছিলেন। তাঁহাদের তিনজনের কোমরে শক্ত দড়ি ছিল—দড়ির অপর প্রান্তে একখানা শ্লেজের সঙ্গে বাঁধা ছিল। স্কট্ ও তাঁহার একটি সঙ্গী একটু আগে আগে চলিতেছিলেন। চলিতে চলিতে হঠাৎ একটা ফাটলের মধ্যে তাঁহারা পড়িয়া গেলেন। ফাটলের মুখ বরফে ঢাকা ছিল বলিয়া তাঁহারা পূর্বে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। দড়িতে টান পড়িতেই পিছনের শ্লেজখানি ফাটলের মুখে আসিয়া আটকাইয়া গেল। তখন দড়ি বাহিয়া তাঁহারা অতি কষ্টে উপরে উঠিয়া আসিলেন। শ্লেজখানি ঐভাবে ফাটলের মুখে বাধিয়া গিয়াছিল বলিয়াই ইহাদের জীবন রক্ষা হইল। মেরুযাত্রীর জীবনে এরূপ বিপদ প্রায়ই ঘটে, মৃত্যু ইঁহাদের নিত্যসহচর।

ক্যাপ্টেন স্কট্ ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলে সকলেই তাঁহার কার্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পদোন্নতি হইল। একদিন ইংলণ্ডের লোকে শুনিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল যে ক্যাপ্টেন স্কট্ তাঁহার এত বড় চাকুরি ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি দক্ষিণমেরু অভিযানের জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হইল—নানারূপ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য, ঔষধ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যে জাহাজ পূর্ণ হইল। প্রয়োজনীয় অসীম সাহসী সহচরসহ ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন ক্যাপ্টেন স্কট্ সমস্ত দেশবাসীর আশীর্বাদ মাথায় লইয়া যাত্রা করিলেন।

সাত মাস সমুদ্রের উপর দিয়া জাহাজ চলিল। তারপর আর জাহাজে অগ্রসর হওয়া যায় না—বড় বড় বরফের স্তূপ জাহাজের গতিরোধ করিল। স্কট্ তখন সদলবলে জাহাজ ছাড়িয়া নামিয়া পড়িলেন। তাঁহারা কখনও কঠিন কঠিন বরফের উপর দিয়া

কখনও পাহাড়ের গা বাহিয়া, কখনও শ্লেজে, কখনও পদব্রজে, ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন।

প্রায় এক বৎসর ধরিয়া তাঁহারা ধীরে ধীরে মেরুর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তাঁহারা একটি পর্বতের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিলেন, সেখান হইতে তাঁহাদের গন্তব্যস্থান একশত সত্তর মাইল। এই অবশিষ্ট পথ অতি ভয়ঙ্কর। শীতের তীব্রতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং ঐ পর্বতের উপর

তিনি শিবির স্থাপন করিলেন। চারিজন সঙ্গী লইয়া তিনি যাত্রা করিলেন। অবশিষ্ট সঙ্গীগণকে ঐ শিবিরে তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতে বলিয়া গেলেন। এক মাসের মধ্যেই তাঁহারা মেরু প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিয়া আসিবেন।

১৮ই জানুয়ারী তাঁহারা মেরুপ্রান্তে উপনীত হইলেন। কিন্তু সেখানে গিয়া দেখিলেন যে, সেই জনশূন্য প্রান্তরে নরওয়ে দেশের জাতীয় পতাকা উড়িতেছে। এমাণ্ডসন নামে নরওয়ের একজন

সাহসী যুবক দক্ষিণমেরু আবিষ্কার করিতে বাহির হইয়া একমাস পূর্বে এই স্থানে পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহার পরিত্যক্ত শিবির তখনও দাঁড়াইয়া আছে, এবং শিবিরের মধ্যে অনেক কাগজপত্র পড়িয়া আছে।

স্কট্ ফিরিয়া চলিলেন। এইবার অদৃষ্ট তাঁহার প্রতিকূল হইয়া উঠিল। তাঁহার সঙ্গীগণ ধীরে ধীরে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু তিনি সর্বদা তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। একদিন হঠাৎ তাঁহার একটি সঙ্গী পড়িয়া গেল, তাহার মাথায় খুব আঘাত লাগিল, সেই আঘাতের ফলেই তাহার মৃত্যু ঘটিল। কয়েকদিন চলার পর হঠাৎ বাতাসের বেগ বাড়িয়া গেল ; অত্যন্ত শীতও পড়িল। আর অগ্রসর হওয়া যায় না, প্রতি পদক্ষেপ কষ্টকর মনে হইতে লাগিল। বায়ুর বেগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—মনে হইল বাতাস বুঝি গায়ের মাংস কাটিয়া লইয়া যাইতেছে! এই অবস্থায় স্কট্ আরও একটি সঙ্গী হারাইলেন। দুর্যোগ ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে, শরীরও ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়িতেছে—তবুও তাঁহারা চলিতেছেন। সঙ্গে যে খাদ্য ছিল তাহাও নিঃশেষ, আর এগার মাইল পথ চলিতে পারিলেই তাঁহারা শিবিরে পৌঁছিতে পারেন—সেই শিবিরে অবশিষ্ট সঙ্গীরা তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে—সেখানে খাদ্য, ঔষধ, বস্ত্র, কোনও জিনিসের অভাব নাই। দুর্গম পথে সহস্র মাইল তাহারা অতিক্রম করিয়াছেন, কিন্তু এগার মাইল পথ আর শেষ হইল না। ভয়ানক ঝড় উঠিল, ঝড় থামিল না—দিবারাত্র সমান ভাবে তুষার-ঝটিকা বহিতে লাগিল। খাদ্য ফুরাইয়া গিয়াছে, পোশাক-পরিচ্ছদ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, দুর্বল দেহ লইয়া এই অবস্থায় আর কতদিন মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে? স্কটের সঙ্গী দুইজন আর সহ্য করিতে পারিল না। স্কট্ যখন বুঝিলেন যে জীবনরক্ষা করা

অসম্ভব, তখন দেশবাসীকে উদ্দেশ করিয়া তিনি কাগজে লিখিলেন, "একমাস আমরা যে কষ্ট পাইলাম, কোন মানুষ বোধ হয় তত কষ্ট পায় নাই। দুঃখ নাই—ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। যদি বাঁচিতাম তাহা হইলে আমার সঙ্গীদের বীরত্ব ও সাহসের কথা দেশবাসীকে শুনাইতে পারিতাম।"

ক্যাপ্টেন স্কটের সন্ধানে যাহারা বাহির হইয়াছিল, তাহারা তাঁহার মৃত্যুর আট মাস পরে এই চিঠি ও তাঁহার মৃতদেহ কুড়াইয়া পাইয়াছিল।

অনুশীলনী

১। ক্যাপ্টেন স্কট্ কোন্ দেশের অধিবাসী? তিনি কোন্ বিভাগে কাজ করিতেন? উত্তরমেরুর সহিত দক্ষিণমেরুর পার্থক্য সম্বন্ধে তিনি কি বলিয়াছেন?

২। ক্যাপ্টেন স্কটের দক্ষিণমেরু অভিযানের বিষয় তোমার নিজের ভাষায় লিখ।

৩। স্কটের পূর্বে কে দক্ষিণমেরুতে পৌছাইয়াছিলেন? তিনি কোন্ দেশের অধিবাসী? তাঁহার অভিযানের কাহিনী স্কট্ কিভাবে জানিতে পারিলেন?

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ লিখ :—
তীব্রভাবে, উদ্ভিদ, আবৃত, প্রান্ত, নিত্যসহচর, শ্লেজ, প্রতিকূল, অবসন্ন, স্পন্দন।

৫। নিম্নলিখিত শব্দগুলি দিয়া বাক্য রচনা কর :—
তুষার-ঝটিকা, জীবনরক্ষা, পদব্রজে, প্রদক্ষিণ, উপনীত, দুর্যোগ।

৬। কোন্‌টি কি পদ বল :—
সাহসী, প্রকাণ্ড, তীব্রতা, অবশিষ্ট, পরিত্যক্ত, দুর্বল, বীরত্ব।

আইন প্রসঙ্গ

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়

[প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ছোট গল্পে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবীদার। রবীন্দ্রভক্ত হইয়াও তিনি আগাগোড়া রবীন্দ্রনাথ হইতে পৃথক। তাঁহার 'আইন-প্রসঙ্গ' গল্পটি "দেশী ও বিদেশী" গ্রন্থের অন্তর্গত।]

ছেলেরা ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে উপরে তাঁহার শয়নকক্ষে গেল। বলিল, "কেন আপনি ভাত খেলেন না বলুন।"

ভট্টাচার্য বলিলেন, "না কিছু নয়। পেটে কেমন হঠাৎ একটা ব্যথা বোধ হ'ল।"

কার্তিকবাবু বলিলেন, "এই বললেন মাথা ধরেছে, আবার বলছেন পেটে ব্যথা—আসল কথাটি কি খুলে বলুন। কি হয়েছে ? কেন খেলেন না ? মাখা ভাত ফেলে রাখলেন, তার কারণ কি "

ভট্টাচার্য মহাশয় হুঁকাটি হাতে করিয়া গম্ভীরভাবে কলিকায় ফুৎকার দিতে লাগিলেন।

শরৎবাবু বলিলেন, "ভট্‌চার্য মশাই !"

"কি ?"

"কি হয়েছে বলুন।"

ভট্টাচার্য তখন হুঁকাটি নামাইয়া, ত্রস্তভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন পরে স্বর নামাইয়া বলিলেন, "সে রামনিধি কোথায়?"

"বোধ হয় নিজের ঘরে গিয়ে শুয়েছে।"

তখন ভট্টাচার্য মহাশয় ধীরে—অতি ধীরে বলিতে লাগিলেন, "ঐ রামনিধি—পাজী বেটা—নচ্ছার বেটা—তোমাদের কাছে নিজেকে কায়স্থ বলে' পরিচয় দিয়েছে?"
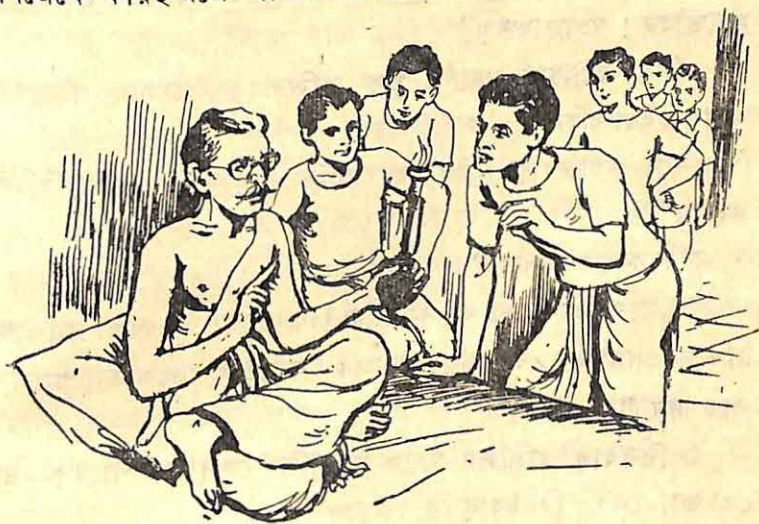
"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

ভট্টাচার্য ক্রোধে স্বর কাঁপাইয়া বলিলেন, "হুঁঃ! কায়স্থ। বেটা সাত জন্মে কায়স্থ নয়—হারামজাদা বেটার চৌদ্দপুরুষ কায়স্থ নয়। ছি-ছি-ছি—ঘোর কলি ঘোর কলি!"

দুই-তিন জনে জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি তবে?"

ভট্টাচার্য বলিলেন,—"ধোপা—ধোপা—ওর বাপের নাম রেদো ধোপা। বেটা বলে আমার বাবার নাম রাধানাথ।—রাধানাথ! রেদো ধোপা বলেই ত চিরকাল জানি। এদানীং রেদো হঠাৎ বড়-

মানুষ হয়ে পড়েছিল বটে—আঙল ফুলে কলাগাছ—কিন্তু আমরাই ছেলেবেলায় তাকে কালীদীঘির ঘাটে হিস্‌সো হিস্‌সো করে কাপড় কাচতে দেখেছি। ছি-ছি-ছি-ছি! ধোপার সঙ্গে এক ঘরে বসে কি আমি ভাত খেতে পারি? আমি গরীব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ওসব খ্রীষ্টানী ম্লেচ্ছাচার আমার সইবে কেন? ছি-ছি-ছি-ছি—তোমরা এতগুলো ভদ্রসন্তান—কায়স্থ সেজে এসে তোমাদেরও জাতটে খেয়েছে! মহাভারত! মহাভারত!!"

বলিয়া ভট্টাচার্য মহাশয় চুপ করিলেন। ছেলেরা কিছুক্ষণ অবাক হইয়া রহিল।

শেষে শচীন্দ্রবাবু বলিলেন, "কার্তিকবাবু—এর একটা বিহিত করুন।"

"কি করতে বলেন?"

"পুলিশে দিন। এত বড় আস্পর্ধা! আমাদের এতগুলো লোককে ঠকিয়ে আমাদের সর্বনাশটা করলে। কনষ্টেবল ডেকে হ্যাণ্ডোভার করে দিন।"

কার্তিকবাবু বলিলেন, "এতে কি পুলিশ কেস্‌ হতে পারে? তা তো জানিনে। বিনয়বাবু কি বলেন?"

বিনয়বাবু কাছে বসিয়াছিলেন—তিনি আইন অধ্যয়ন করিতেন। বলিলেন, "পুলিশ কেস্‌! কোন্‌ ধারায় হবে?"

শচীন্দ্রবাবু বলিলেন, "ধারা-ফারা আপনি বুঝুন। এত বড় একটা অন্যায়, আইনে এর সাজার বিধান নেই কখনও হ'তে পারে!"

বিনয়বাবু চিন্তাযুক্ত হইয়া বলিলেন, "কি জানি চিটিং-এর মধ্যে পড়ে কিনা।—হুয়েভার—হুয়েভার—দূর হক্‌গে ছাই—চিটিং-এর ডেফিনিশনটাও ভাল মনে পড়ছে না। বইটা দেখি তাহ'লে।" বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

ভট্টাচার্য মহাশয় দেখিলেন, "মহাবিপদ উপস্থিত। রামনিধিকে পুলিশে দিলে ভট্টাচার্য মহাশয়কেই প্রধান সাক্ষী দিতে হইবে। একবার তিনি একটা বিবাহের মকদ্দমায় সিউড়িতে সাক্ষী দিতে গিয়াছিলেন—উকীলের জেরায় তাঁহাকে অসংস্কৃতজ্ঞ প্রমাণ করিবার জন্য শব্দরূপ ধাতুরূপ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। সেই অবধি উকীলগণকে তিনি বড় ডরাইতেন। তাই তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না না, পুলিশে দিয়ে কাজ নেই—পুলিশে দিয়ে কাজ নেই। কালকে ওকে বোলো এখন যে, আপনি অন্য বাসায় যান।"

শচীন্দ্রবাবু গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তাড়াও। কান ধরে বের করে দাও। কাল কি? আজ—এই দণ্ডে—এখ্খুনি। এস।"

বাসার অন্য সকলেও যথেষ্ট উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা সমবেত হইয়া ক্রোধে রামনিধির শয়নকক্ষ অভিমুখে অগ্রসর হইল। ভট্টাচার্য মহাশয়ও উঠিলেন; বলিলেন, "শোন শোন! আস্তে আস্তে ভাল কথায় বিদায় করে দাও। খবরদার যেন গায়ে হাত তুলো না।" পুলিশ কোর্ট ও উকীলের ভয়াবহ মূর্তি বিভীষিকার ন্যায় ভট্টাচার্যের মনে ছায়া বিস্তার করিতেছিল।

অনুশীলনী

১। 'আইন-প্রসঙ্গ' গল্পটি তোমার নিজের ভাষায় বল।

২। ভট্টাচার্য মহাশয়ের মনোভাবকে তুমি সমর্থন করিতে পার কিনা যুক্তি সহ বল।

৩। মকদ্দমার নামে ভট্টাচার্য মহাশয় ভীত হইয়াছিলেন কেন?

৪। অর্থ লিখ :—শয়নকক্ষে, ব্যথা, ত্রস্তভাবে, এদানীং, সাজা, চিটিং, ডেফিনিশন, ম্লেচ্ছাচার, বিভীষিকা।

৫। বাক্য রচনা কর :—হঠাৎ, নিক্ষেপ, অবাক, আস্পর্ধা, অসংস্কৃতজ্ঞ, ভয়াবহ, অভিমুখে, উত্তেজিত, আঙুল ফুলে কলাগাছ।

=পদ্যাংশ=

প্রার্থনা

প্রিয়ংবদা দেবী

জীবন আমার কর,   আলোকের মত
      সুন্দর নির্মল,
যেথায় যখন রব,   সেস্থান নিয়ত
      করিব উজ্জ্বল।
ওগো দয়াময়, তুমি থাক সাথে সাথে
      আলো করি আমার জীবন,
সুদিনে দুর্দিনে কিংবা অন্ধকার রাতে
      চিরজ্যোতিঃ, থাক অনুক্ষণ।
জীবন আমার কর,   ফুলের মতন
      শোভার আধার,
পবিত্র সুগন্ধে যেন   সবাকার মন
      তুষি অনিবার।
ওগো দয়াময়, তুমি থাক সাথে সাথে
      শোভা করি আমার জীবন,
শরৎ, হেমন্ত, গ্রীষ্ম, বসন্ত, বর্ষাতে
      হে সুন্দর, থাক অনুক্ষণ।
অন্ধের যষ্টির মত   করগো আমারে
      দুঃখীর নির্ভর,

প্রাণপণে আমি যেন দুঃখী অনাথারে
সেবি নিরন্তর।
ওগো দয়াময়, তুমি থাক সাথে সাথে
প্রাণে বল করহ বিধান,
আমার এ জীবনের সন্ধ্যায় প্রভাতে
কাছে থাক, সর্বশক্তিমান্।

অনুশীলনী

১। কে কাহার নিকট কি প্রার্থনা করিতেছে তাহা বল।
২। শব্দার্থ লিখ :—অনুক্ষণ, চিরজ্যোতিঃ, নিরন্তর, সর্বশক্তিমান্।

এই কবিতায় মূল [illegible] ভগবানের উদ্দেশ্যে নিজের মনের প্রার্থনা।

ক্রোধ

কাশীরাম দাস

ক্রোধ সম পাপ আর না আছে সংসারে।
প্রত্যক্ষ শুনহ ক্রোধ যত পাপ ধরে॥
লঘু গুরু জ্ঞান নাহি থাকে ক্রোধ কালে।
অবক্তব্য কথা লোকে ক্রোধ হলে বলে॥
থাকুক অন্যের কথা আত্ম হয় বৈরী।
বিষ খায়, ডুবে মরে, অস্ত্র অঙ্গে মারি'॥
এ কারণে বন্ধুগণ সদা ক্রোধ ত্যজে।
অক্রোধ যে লোক, তাকে—সর্বলোকে পূজে॥
ক্রোধে পাপ, ক্রোধে তাপ, ক্রোধে কুলক্ষয়।
ক্রোধে সর্বনাশ হয় ক্রোধে অপচয়॥
হেন ক্রোধ যেই জন জিনিবারে পারে।
ইহলোক, পরলোক, অবহেলে তরে॥

অনুশীলনী

১। ক্রোধ কাহাকে বলে?

২। ক্রোধের সময় লোকে কি কি অন্যায় করে?

৩। ক্রোধ জয় করিবার উপায় কি?

৪। "অক্রোধ যে লোক, তাকে—সর্বলোকে পূজে"—এ কথার সরল অর্থ বুঝাইয়া দাও।

বঙ্গভাষা

মধুসূদন দত্ত

হে বঙ্গ ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ।
তা সবে (অবোধ আমি), অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
পর দেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি' ।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি'
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায়মন,
মজিনু বিফল-তপে অবরেণ্য বরি ;—
কেলিনু শৈবালে, ভুলি' কমল কানন ।
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা ! মাতৃকোষে রতনের রাজী',
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি' ঘরে ।"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
মাতৃভাষা—রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে ।

অনুশীলনী

১। বঙ্গভাষাকে অবহেলা করিয়া কবির কি দুর্গতি হইয়াছিল ?
২। স্বপ্নে কবিকে কে কী বলিয়া দিয়াছিলেন ?
৩। শব্দার্থ লিখ ঃ—কুক্ষণে, পরিহরি, মজিনু, অবরেণ্য, কেলিনু, শৈবালে, কমল, রাজী ।

আমার সোনার বাংলা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি॥
কী শোভা কী ছায়া গো, কী স্নেহ কী মায়া গো
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে—
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি॥
তোমার এই খেলাঘরে শিশুকাল কাটিল রে—
তোমারি ধূলামাটি অঙ্গে মাখি ধন্য জীবন মানি।
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে কী দীপ জ্বালিস ঘরে,
মরি হায়, হায় রে—
তখন খেলাধূলা সকল ফেলে, ও মা, তোমার কোলে ছুটে আসি॥
ধেনু-চরা তোমার মাঠে, পারে যাবার খেয়াঘাটে,
সারাদিন পাখি-ডাকা ছায়ায়-ঢাকা তোমার পল্লীবাটে,

তোমার ধানে ভরা আঙিনাতে জীবনের দিন কাটে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা আমার যে ভাই তারা সবাই, ও মা, তোমার রাখাল
তোমার চাষী ॥

অনুশীলনী

১। 'আমার সোনার বাংলা' কবিতায় কবি বাংলাদেশের কোন্ কোন্ মধুর দৃশ্যের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা তোমার নিজের ভাষায় লিখ।

২। কবিতাটি আবৃত্তি কর।

৩। শব্দার্থ লিখ :—ঘ্রাণে, মূলে, বদন, দীপ, পল্লীবাটে, ধেনু।

৪। কোন্‌টি কি পদ লিখ : —সোনার, পাগল, ভরা, মলিন, জালিস।

বাংলার কবির প্রকৃতির প্রতি কবির নিবিড়
অনুরাগের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিলেন।

বঙ্গ আমার ! জননী আমার ! ধাত্রী আমার ! আমার দেশ !
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন, কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ !
কেন গো মা তোর ধূলায় আসন, কেন গো মা তোর মলিন বেশ !
সপ্তকোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে "আমার দেশ"—
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ !
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন "আমার দেশ"।
উদিত যেখানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষদ্বার,
আজিও জুড়িয়া অর্ধ-জগৎ ভক্তি-প্রণত চরণে যাঁর ;
অশোক যাঁহার কীর্তি ছাইল গান্ধার হ'তে জলধি শেষ।
তুই কিনা মাগো তাঁদের জননী ! তুই কিনা মাগো তাঁদের দেশ !
একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগরময় ;
সন্তান যার তিব্বত-চীন-জাপানে গঠিল উপনিবেশ,
তার কিনা এই ধূলায় আসন, তার কিনা এই ছিন্ন বেশ !
উদিল যেখানে মুরজমন্দ্রে নিমাই-কণ্ঠে মধুর তান,
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি চণ্ডীদাসও গাহিল গান ;
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য তুই ত না সেই ধন্য দেশ !
ধন্য আমরা, যদি এ শিরায় থাকে তাঁদের রক্তলেশ।

তোমার ধানে ভরা আঙিনাতে জীবনের দিন কাটে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা আমার যে ভাই তারা সবাই, ও মা, তোমার রাখাল
তোমার চাষী ॥

অনুশীলনী

১। 'আমার সোনার বাংলা' কবিতায় কবি বাংলাদেশের কোন্ কোন্ মধুর দৃশ্যের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা তোমার নিজের ভাষায় লিখ।

২। কবিতাটি আবৃত্তি কর।

৩। শব্দার্থ লিখ :—ঘ্রাণে, মূলে, বদন, দীপ, পল্লীবাটে, ধেনু।

৪। কোন্‌টি কি পদ লিখ : —সোনার, পাগল, ভরা, মলিন, জালিস।

বঙ্গ আমার ! জননী আমার ! ধাত্রী আমার ! আমার দেশ !
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন, কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ !
কেন গো মা তোর ধূলায় আসন, কেন গো মা তোর মলিন বেশ !
সপ্তকোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে "আমার দেশ"—
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ !
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন "আমার দেশ"।
উদিত যেখানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষদ্বার,
আজিও জুড়িয়া অর্ধ-জগৎ ভক্তি-প্রণত চরণে যাঁর ;
অশোক যাঁহার কীর্তি ছাইল গান্ধার হ'তে জলধি শেষ।
তুই কিনা মাগো তাঁদের জননী ! তুই কিনা মাগো তাঁদের দেশ !
একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগরময় ;
সন্তান যার তিব্বত-চীন-জাপানে গঠিল উপনিবেশ,
তার কিনা এই ধূলায় আসন, তার কিনা এই ছিন্ন বেশ !
উদিল যেখানে মুরজমন্দ্রে নিমাই-কণ্ঠে মধুর তান,
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি চণ্ডীদাসও গাহিল গান ;
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য তুই ত না সেই ধন্য দেশ !
ধন্য আমরা, যদি এ শিরায় থাকে তাঁদের রক্তলেশ।

যদিও মা তোর দিব্য-আলোকে ঘেরে আছে আজ আঁধার ঘোর
কেটে যাবে মেঘ নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর ;
আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য ! মানুষ আমরা নহি ত মেষ !
দেবী আমার ! সাধনা আমার ! স্বর্গ আমার ! আমার দেশ !

অনুশীলনী

১। "বঙ্গ আমার" কবিতাটি মুখস্থ কর।

২। কবিতাটির বিষয়বস্তু তোমার নিজের ভাষায় লিখ।

৩। শব্দার্থ লিখ :—

ধাত্রী, রুক্ষ, মোক্ষ দ্বার, জলধি, অর্ণবপোত, মুরজমন্দ্রে, ভাতিবে, দিব্য-আলোক।

৪। টীকা লিখ :—বুদ্ধ, অশোক, উপনিবেশ, নিমাই, রঘুমণি, চণ্ডীদাস, প্রতাপাদিত্য।

সিদ্ধার্থের দয়া

নবীনচন্দ্র সেন

একদিনে নিরজনে মনোহর পুরোদ্যানে
সিদ্ধার্থ ভাবিতেছিলা বসি' অন্যমন ;
শুক্লমেঘখণ্ড মতো রাজহংস শত শত
আনন্দলহরী পূর্ণ করিয়া গগন
যাইছে ভাসিয়া সুখে ; হঠাৎ আহত বুকে
একটি কুমার অঙ্কে হইল পতন।
উদ্ধার করিতে শরে লাগিল কোমল করে,
কুমার বেদনা এই বুঝিল প্রথম,
অধীর হইল প্রাণ, বহিল প্রথম এই
বিশ্বব্যাপী করুণার পুণ্য-প্রস্রবণ।
করুণার অশ্রুজলে করুণার পরশনে
হইল বিগত ব্যথা, বাঁচিল মরাল।
কুমার লইয়া বুকে, মুগ্ধ জননীর মতো
চাহি' ক্ষুদ্র মুখ-পানে রহে কিছুকাল।

কি মহিমা করুণার ! কাননের বিহঙ্গেও
বুঝে তাহা, কি মধুর করে প্রতিদান।
উভয়ে উভয় পানে নীরবে চাহিয়া কিবা
করুণায় উভয়ের বিমোহিত প্রাণ !
আসি' দেবদত্ত কহে— "কুমার এ হংস মম
মম শরে হ'য়ে হত পড়েছে ভূতলে !"
কুমার কহিল ধীরে,— "হত জীব হত্যাকারী
পায় যদি, ভাই, কোন্ ধর্মশাস্ত্র বলে,
যে দেয় জীবন তারে, সে কি তারে পাইবে না ?
হত নহে, এই হংস আহত কেবল।
আঘাতের ব্যথা ভাই, আজি বুঝিয়াছি আমি,
হংসের ব্যথায় প্রাণ হয়েছে বিকল !
তোমারো ত' আছে প্রাণ ; পাখিটির ক্ষুদ্র প্রাণে,
বুঝ' না কি, কি যে ব্যথা পেয়েছে ভীষণ ?
লও তুমি শাক্য রাজ্য, আমি নাহি চাহি তাহা ;
এ হংস আমার, আমি দিব না কখন।"
শাক্য পুত্র দেবদত্ত, স্তম্ভিত বিস্মিত চিত্ত,
দেখিল—কুমার নহে, মূর্তি করুণার !
ফিরিল নীরবে গৃহে উড়িল মরাল সুখে,
কলকণ্ঠে এ করুণা করিয়া প্রচার।

অনুশীলনী

১। কবিতাটি আবৃত্তি কর।
২। কবিতার বিষয়বস্তু তোমার নিজের ভাষায় বল।

৩। কারণ সহ বল তুমি কাহাকে সমর্থন কর :—সিদ্ধার্থকে না দেবদত্তকে ?

৪। শব্দার্থ লিখ :—

পুরোদ্যানে, অধীর, প্রস্রবণ, বিহঙ্গ, বিমোহিত, স্তম্ভিত, বিস্মিত, মরাল, করুণা।

৫। নিম্নের অংশটুকুর সরল অর্থ বুঝাইয়া দাও :—

কি মহিমা করুণার ! কাননের বিহঙ্গেও
বুঝে তাহা, কি মধুর করে প্রতিদান।

কোন্ দেশে

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কোন্ দেশেতে তরুলতা—
সকল দেশের চাইতে শ্যামল ?
কোন্ দেশেতে চলতে গেলেই—
দলতে হয় রে দূর্বা কোমল ?
কোথায় ফলে সোনার ফসল,—
সোনার কমল ফোটে রে ?
সে আমাদের বাংলাদেশ
আমাদেরি বাংলা রে !
কোথায় ডাকে দোয়েল শ্যামা—
ফিঙে গাছে গাছে নাচে ?
কোথায় জলে মরাল চলে—
মরালী তার পাছে পাছে ?
বাবুই কোথা বাসা বোনে—
চাতক বারি যাচে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !

কোন্ ভাষা মরমে পশি'—
আকুল করি' তোলে প্রাণ?
কোথায় গেলে শুনতে পাব—
বাউল সুরে মধুর গান?
চণ্ডীদাসের—রামপ্রসাদের—
কণ্ঠ কোথায় বাজে রে?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে!

কোন্ দেশের দুর্দশায় মোরা—
সবার অধিক পাইরে দুখ?
কোন্ দেশের গৌরবের কথায়—
বেড়ে উঠে মোদের বুক?
মোদের পিতৃপিতামহের—
চরণধূলি কোথা রে?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে!

অনুশীলনী

১। 'কোন্ দেশে' কবিতাটি আবৃত্তি কর।

২। কোন্ ভাষা মরমে পশি'—
আকুল করি' তোলে প্রাণ?—এখানে কোন্ ভাষার কথা বলা হইয়াছে? সেই ভাষা প্রাণকে আকুল করিয়া তোলে কেন?

৩। শব্দার্থ লিখ:—তরুলতা, মরাল, কমল, বারি, মরমে, চরণধূলি, দুর্দশা, পশি।

৪। কোন্‌টি কি পদ বল—শ্যামল, চাতক, কণ্ঠ, কোমল, অধিক।

৫। বাংলার দুই গায়ক—চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদ—ইহাদের সম্বন্ধে আরও পরিচয় জানিতে চেষ্টা কর।

রাঙাচুড়ি

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

পিতা ফিরিলেন বাড়ী রাঙা চুড়ি রাঙা শাড়ী
আনিলেন মেয়েটির তরে,
সেই চুড়ি পরি' হাতে সে আজ আমোদে মাতে,
দেখায়ে বেড়ায় ঘরে ঘরে।
সানাই শুনিয়া কানে পূজার মণ্ডপ পানে
ছুটে যেতে পড়িল ধুলায় ;
ভাঙ্গিয়া কাচের চুড়ি একেবারে হ'ল গুঁড়ি,
ক্ষতি তার ক্ষতেরে ভুলায়।
উঠিবে না ধূলা ঝাড়ি' ফিরিতে চাহে না বাড়ী
কাঁদে শুধু গলা ছাড়ি দিয়া ;
ভাঙ্গা চুড়ি বার বার জোড়া দেয়, হাহাকার
করে পথে লুটিয়া লুটিয়া।
পিতা আসি তুলি বুকে বলে চুমা দিয়ে মুখে,
"গেছে যাক্ ভারি ওর দাম।"
থামে নাক' কোন মতে তবু খুকী শুয়ে পথে
ফুঁপিয়া কাঁদে যে অবিরাম।

ব্যথা কি বুঝিবে তারা সব জিনিসের যারা
দাম কষে টাকায় আনায় ?
প্রাণের বাঞ্ছিত যাহা যত তুচ্ছ হোক তাহা
মিলিবে কি রূপায় সোনায় ?
সমগ্র বালিকা প্রাণ চুড়ি সনে খান খান
বল কেবা দিবে দাম তার ?
এমন পূজার দিনে সেই রাঙা চুড়ি বিনে
তার যে এ ভুবন আঁধার ॥

অনুশীলনী

১। রাঙা চুড়ি পাইয়া মেয়েটির মনের আনন্দ বর্ণনা কর।
২। রাঙা চুড়ি হারাইয়া মেয়েটির মনের দুঃখ বর্ণনা কর।
৩। সরল অর্থ বুঝাইয়া লিখ :—
"ব্যথা কি বুঝিবে তারা সব জিনিসের যারা
দাম কষে টাকায় আনায় ?

অভিযান

কাজী নজরুল ইসলাম্

নতুন পথের যাত্রা-পথিক
চালাও অভিযান
উচ্চকণ্ঠে উচ্চার আজ—
“মানুষ মহীয়ান্ !”
চারিদিকে আজ ভীরুর মেলা,
খেলবি কে আয় নতুন খেলা ?
জোয়ার জলে ভাসিয়ে ভেলা
বাইবি কে উজান ?
পাতাল ফেড়ে চলবি মাতাল
স্বর্গে দিবি টান্॥
সমর সাজের নাই রে সময়
বেরিয়ে তোরা আয়,
আজ বিপদের পরশ নেব
নাঙ্গা আতুল গায়।
আসবে রণসজ্জা কবে
সেই আশায়ই রইলি সবে।

রাত পোহাবে প্রভাত হ'বে
গাইবে পাখি গান।
আয় বেরিয়ে সেই প্রভাতে
ধরবি যারা তান॥
আঁধার ঘোরে আত্মঘাতী
যাত্রা-পথিক সব
এ উহারে হানছে আঘাত
করছে কলরব।
অভিযানের বীর সেনাদল
জ্বালাও মশাল, চল্ আগে চল্।
কুচকাওয়াজের বাজাও মাদল,
গাও প্রভাতের গান।
ঊষার দ্বারে পৌঁছে গাবি
"জয় নব উত্থান।"

অনুশীলনী

১। 'অভিযান' কথার অর্থ কি? কবি কাহাদিগকে কিভাবে অভিযান চালাইতে নির্দেশ দিয়াছেন?

২। কবিতাটি আবৃত্তি কর।

৩। শব্দার্থ লিখ:—নাঙ্গা, আদুল, আত্মঘাতী, হানছে, কুচকাওয়াজ।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

মেয়েদের পদবীতে গোলমাল ভারী,
অনেকের নামে তাই দেখি বাড়াবাড়ি ;
আ-কার অন্ত দিয়ে মহিলা করার
চেষ্টা হাসির ! তাই ভূমিকা ছড়ার।
'গুপ্ত' 'গুপ্তা' হয় মেয়েদের নামে,
দেখেছি অনেক চিঠি, পোস্টকার্ড, খামে।
সে নিয়মে যদি আজ ঘোষ' হয় 'ঘোষা',
তাহলে অনেক মেয়ে করবেই গোসা,
'পালিত' 'পালিতা' হলে 'পাল' হয় 'পালা'
নির্ঘাত বাড়বেই মেয়েদের জ্বালা ;
'মল্লিক' 'মল্লিকা', 'দাস' হলে 'দাসা'
শোনাবে পদবীগুলো অতিশয় খাসা,
'কর' যদি 'করা' হয় 'ধর' হয় 'ধরা'
মেয়েরা দেখবে এই পৃথিবীটা—"সরা"।
'নাগ' যদি 'নাগা' হয় 'সেন' হয় 'সেনা'
বড়ই কঠিন হ'বে মেয়েদের চেনা ॥

অনুশীলনী

১। কবিতাটি আবৃত্তি কর।

সৎপাত্র

সুকুমার রায়

শুনতে পেলুম পোস্তা গিয়ে—
তোমার নাকি মেয়ের বিয়ে ?
গঙ্গারামকে পাত্র পেলে ?
জানতে চাও সে কেমন ছেলে ?—
মন্দ নয়, সে পাত্র ভালো—
রঙ যদিও বেজায় কালো ;
তার উপরে মুখের গঠন
অনেকটা ঠিক পেঁচার মতন।
বিদ্যে বুদ্ধি ? বলছি মশাই—
ধন্যি ছেলের অধ্যবসায় !
উনিশটিবার ম্যাট্রিকে সে
ঘায়েল হয়ে থামল শেষে।
বিষয় আশয় ? গরীব বেজায়—
কষ্টে-সৃষ্টে দিন চলে যায়।

মানুষ তো নয় ভাইগুলো তার—
একটা পাগল একটা গোঁয়ার ;
আর একটি সে তৈরী ছেলে,
জাল করে নোট গেছেন জেলে।
কনিষ্ঠটি তবলা বাজায়
যাত্রাদলে পাঁচ টাকা পায়।
গঙ্গারাম ত কেবল ভুগে
পিলের জ্বর আর পাণ্ডু রোগে।
কিন্তু তারা উচ্চ ঘর
কংসরাজের বংশধর,
শ্যাম লাহিড়ী বনগ্রামের
কি যেন হয় গঙ্গারামের।
যা হোক এবার পাত্র পেলে,
এমন কি আর মন্দ ছেলে ?

অনুশীলনী

১। কবির বর্ণনা অনুসারে সৎ পাত্রের পরিচয় তোমার নিজের ভাষায় লিখ।